মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন

ইরান বিপ্লব

একটি পর্যালোচনা

www.nagorikpathagar.org

ইরান বিপ্লব ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন

শহীদ স্মৃতি প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক ঃ
শহীদ স্মৃতি প্রকাশনীর পক্ষে
মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
১, কে, এম, দাস লেন, ঢাকা—৩

প্রকাশকাল ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৮২

প্রচ্ছদ ঃ
নূরুল ইসলাম
গ্রাফিক প্রসেস ষ্টুডিও

মুদ্রক ঃ
শতাব্দী প্রিন্টিং প্রেস
৩২/২ বি. কে. গাঙ্গুলী লেন—ঢাকা

মূল্য ঃ ৬·৫০ টাকা।

IRAN BIPLOB : EKTI PARJAOYCHANA
(A Review on the Revolution of Iran)
By Muhammad Salahuddin
Published By Mohammed Asad Ullah
1. K.M. Dass Lane, Dacca-3

PRICE TAKA 6·50

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

চৌদ্দশো বছর আগে পৃথিবীর একটা অনুন্নত, অনুর্বর এলাকায়, সভ্যতার আলোক বিবর্জিত জনগোষ্ঠীর সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ইসলাম যে বিপ্লব এনেছিল তা সমকালীন দুটো বৃহৎ সভ্যতা ও রাজশক্তিকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পংগু করে দিয়েছিল। দিশেহারা মানুষ যেমন পথের সন্ধান পেয়েছিল তেমনি মজলুম বিশ্বমানবতা পেয়েছিল মুক্তির স্বাদ। সততা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে ইসলাম জন্ম দিয়েছিল একটি বিস্ময়কর সভ্যতার। মানুষকে মানুষের দাসত্বমুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসে পরিণত করে মানুষকে যথার্থ মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। সেদিন ইসলামের অর্থই ছিল বিপ্লব।

কালের আবর্তনে মুসলমানরা ইসলামের এই বিপ্লবী শক্তির অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এভাবেই একদিন বিপ্লবের শক্তি চলে গেলো ইসলাম বিরোধী সভ্যতার হাতে। পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও কমিউনিজম হলো বিপ্লবের উদ্গাতা। ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব হলো বিশ্বমানবতার আদর্শ। কিন্তু এ বিপ্লবগুলো যে নিছক মরীচিকা তা বুঝতে মানুষের আজ আর বাকি নেই। এদের কাছ থেকে মানবতা বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। অর্ধশত বছরব্যাপী দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পরিচালিত ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলো তাই বিশ্বমানবতার আন্তরিক চাহিদার যথার্থ অভিব্যক্তি। ইরান এক্ষেত্রে যে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

ইরান বিপ্লব আর একবার প্রমাণ করে দিল যে, ইসলামের বিপ্লবী শক্তি এখনো অবিকৃত রয়ে গেছে। বরং আসল বিপ্লবী শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে ইসলাম। করাচীর বহুল প্রচারিত দৈনিক 'জাসারাত'-এর সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন ইরান সফরশেষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত ১৩ কিস্তীতে উক্ত পত্রিকায় এ নিবন্ধগুলো লেখেন। ইরান বিপ্লবের পটভূমি, তার বর্তমান অবস্থা, বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শক্তি, তার শত্রু ও মিত্র এবং এই সংগে ভবিষ্যতের কিছু আশংকাও তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে। দরদী মন নিয়ে তিনি ইরান বিপ্লবের যে পর্যালোচনা করেছেন তা এদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য মূল্যবান সম্পদ বিবেচিত হবে। এবিপ্লব থেকে আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পারি, নিজেদের দেশে ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য আমরা এখান থেকে কি গাইড লাইন পেতে পারি এবং তার কতটুকু আমাদের উপযোগী এ বইয়ের সুদীর্ঘ তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা পাঠের পর তা পাঠকদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সফলতা দান করুন এবং আমাদেরকে সঠিক পথ গ্রহণের তওফীক দান করুন। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

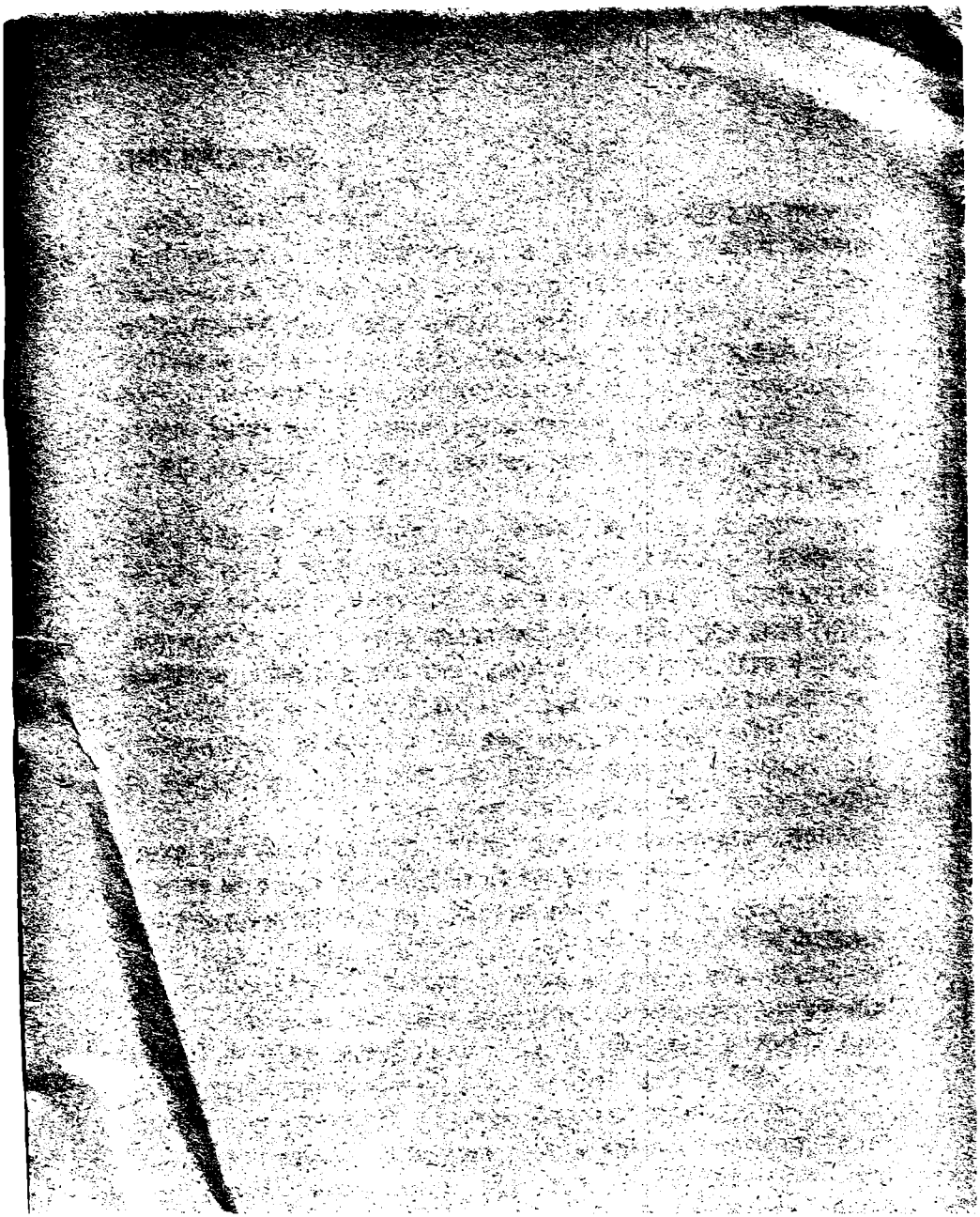

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব ইতিহাসের এমন কোনো যুগ নির্দেশ করা যাবে না যে যুগে ইরান কোনো না কোনো দিক দিয়ে গুরুত্ব অর্জন করেনি। বিভিন্ন সময়ে দেশটির সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও হামেশা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে তার অবস্থান। আশে পাশের দেশগুলোর সাথে তাকে সব সময় সংগ্রামরত অবস্থায় থাকতে হয়েছে। রাজনৈতিক বিচারে তাকে কখনো বিজয়ী আবার কখনো বিজিতের সারিতে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য সব সময় প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। ইসলাম গ্রহণ করার পরও এ দেশটি নিজের বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন রাখে। আরবরা বিজিত বাই-জাইন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরাট এলাকায় এবং ইউরোপের স্পেনেও নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঝাণ্ডা উড়ায়। কিন্তু আজম কেবল তার বৈশিষ্ট অবিকৃত রেখেই ক্ষান্ত হয়নি বরং উলটো আরবদের এবং সেই সংগে মুসলিম বিশ্বের বিরাট অংশেও নিজের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তৃত করেছে। হিমালয়ান উপ-মহাদেশে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা করে আরবরা। ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে মোগলদের সাহায্যে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে ইরানী সংস্কৃতির দরজা এমনভাবে উন্মুক্ত হয় যে মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই সমগ্র উপমহাদেশ ইরানী সংস্কৃতির জোয়ারে প্লাবিত হয়। ভাষা-সাহিত্য, রসম-রেওয়াজ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবধারা, লেবাস-পোশাক এমন কি সমাজে বসবাস করার পদ্ধতিও তার প্রভাবাধীনে এসে নতুন সাজে সজ্জিত হয়। ইরানের ওপর বাইরের প্রভাবও পড়েছে। কিন্তু অন্যের প্রভাব গ্রহণের ব্যাপারে সে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী প্রমাণ করেছে। এর আসল কারণ হচ্ছে জ্ঞান-শিল্প-সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার শক্তির ধারাবাহিকতা। হাফীজ, সাদী ও ওমর খৈয়ামের এ সরজমিন কাব্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কালাম-শাস্ত্র এবং জ্ঞান ও শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন সব কালোত্তর প্রতিভার জন্ম দিয়েছে যারা যুগে যুগে সমগ্র বিশ্বে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষ করে বিশ্ব সাহিত্য ক্ষেত্রে ইরানী কবিদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

ইতিহাসের প্রতি যুগেই ইরান তার আভ্যন্তরীন শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের আকারে তার এ শক্তিমত্তার যে সাম্প্রতিকতম প্রকাশ ঘটেছে, তা কেবলমাত্র তার নিজের ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এমন এক মহান ঘটনার সংযোজন করেছে, যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে

www.nagorikpathagar.org

হতবাক করে দিয়েছে। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী বৃহত শক্তিগুলো বিশেষ করে আমেরিকাকে তা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে।

ইরানের আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্র দুনিয়ার প্রাচীনতম রাজ পরিবার ও রাজতন্ত্রের দাবীদার ছিল। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে তারা দাবী করতো। তাদের অস্ত্রাগারে স্তূপীকৃত ছিল বিশ্বের আধুনিকতম অস্ত্র। ব্যক্তি ও ব্যক্তির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের ছিল অসংখ্য সংগঠন। জনগন ও বিরোধী পক্ষের ওপর জুলুম নির্যাতন চালাবার জন্য ছিল নতুন নতুন অকল্পনীয় উপায়-উপকরণ। দুনিয়ার বৃহত পরাশক্তি আমেরিকার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতাও তারা লাভ করেছিল। কিন্তু এতোসব সত্বেও এই বৃহত রাজশক্তি নিরস্ত্র জনতার ইস্পাত কঠিন সংকল্পের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। ধূলিস্মাৎ হলো তার ক্ষমতার সমস্ত গর্ব-অহংকার। জনতার এ বিজয়কে শুধুমাত্র ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া ইতিহাসে এর আর কোনো নজীর নেই। কিন্তু ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের সাথে গভীর সাদৃশ্য সত্বেও ইরান বিপ্লব এক দিক দিয়ে বিশিষ্ট। পূর্ববর্তী বিপ্লব দুটির সময় দুনিয়ায় পরাশক্তির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সে সময় প্রত্যেকটি দেশ ছিল একটি দ্বীপের মতো। আভ্যন্তরীন বিরোধের সময় তারা প্রায়ই বাইরের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকতো। কিন্তু ইরান বিপ্লবে আসল যুদ্ধ শাহ ও জনগনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। আমেরিকা ও তার মিত্রদের শক্তিও শাহের সহযোগিতায় সক্রিয় ছিল। এদের সবার সম্মিলিত পরাজয় ইরানী জনগনের বিজয়কে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ এ সত্যের প্রতিধ্বনি শুনা যাচ্ছে বিভিন্ন পর্যালোচকের কণ্ঠে। তারা বলতে শুরু করছেন, নিজের বিশেষ আংগিক ও প্রকৃতির কারণে এ বিপ্লবটি ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের ওপরও টেক্কা দিয়েছে। তবে এর একটা পরীক্ষা এখনো বাকি রয়েছে। সেটা হচ্ছে, নিজের চিন্তা ও মতবাদের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং দুনিয়ার সামনে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মডেল উপস্থাপন। এ ব্যাপারে সে কতটুকু সফলকাম হয় সেদিকেই এখন বিশ্ববাসীর সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ইরানে বর্তমানে এই পরীক্ষা নিরীক্ষাই চলছে। বিপ্লবের বয়স বর্তমানে মাত্র তিন বছর। এই স্বল্প সময়কালে ইরানের বিপ্লবী সরকারের ওপর ভেতর-বাহির থেকে যত আঘাত হানা হয়েছে ইতিহাসে তারও কোনো নজীর নেই। এই তিন বছরের মধ্যে ইরান একের পর এক হাজারো আঘাত সহ্য করেছে এবং এভাবে তার সহ্য ক্ষমতা, সংগঠন ও শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছে। বর্তমানে একদিকে সে ইরাকের সাথে যুদ্ধরত আবার অন্যদিকে পরাজিত শক্তিগুলো তাকে আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে পরাজিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে একটি বৃহৎ শক্তি সীমান্তের ওপার থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে মুখ বাড়িয়ে একনাগাড়ে তার অবস্থা জরীপ করে যাচ্ছে। সে ভাবছে কখন তার সুযোগ আসবে।

একজন সাংবাদিক হিসেবে ইরানের ঘটনাবলী প্রথম দিন থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতদিন দূর থেকে আমি তার অবস্থা পর্যালোচনা করছিলাম। সেখানে যাবার এবং সরাসরি ঘটনাবলী ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়নি। অবশ্য নিছক ঘটনাবলী পর্যালোচনার গুরুত্বও নেহাত কম নয়। কিন্তু অনেক সময় তা মনকে কেবল চিন্তা ও কল্পনার গোলক ধাঁধায় নিক্ষেপ করে। বাস্তব ও যথার্থ সত্যের কাছে পেঁছার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

সৌভাগ্যক্রমে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ইরান বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ইরান সফরের আমন্ত্রন পেয়ে সেখানকার বর্তমান অবস্থা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ইরানে আমাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত হলেও এবং পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধাধরা কর্মসূচীতে অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হলেও ইরানের বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করার আমরা যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। বহু নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। অসংখ্য মন্তব্য, পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতার কথা স্বকর্নে শুনেছি। অবস্থার যথার্থ চিত্র উপলব্ধি করার মতো শত শত দৃশ্য আমাদের সামনে এসেছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার সুযোগ হয়েছে। এভাবে বিপ্লবের যথার্থ চিত্রায়ণ অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। ইরানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সারা দুনিয়ায় আজ যে প্রশ্ন গুলো দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে মোটামুটি এই ঃ

১) বর্তমানে ইরানে বিপ্লবের জনপ্রিয়তা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে এবং বিপ্লবের সাথে ইরানী জনগনের আত্মিক যোগ ও আবেগ অনুভূতিও কতটুকু ঘনীভূত ?

২) বিপ্লব তার অভীষ্ট পরিবর্তন সাধন করার ব্যাপারে, সেগুলোকে শক্তিশালী করার ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার ব্যাপারে কতটুকু সফল হয়েছে ?

৩) বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে একাত্মতা ও সহযোগিতা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ ও কোন্দল নেই তো ?

৪) রাজনৈতিক কাঠামো কতটুকু শক্তিশালী এবং আর কতদিনে তা পূর্ণতা লাভ করবে ?

৫) অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ?

৬) ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা কি ?

www.nagorikpathagar.org

৭) ইরাকের সাথে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ দেশে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ?

৮) সাধারণ সমাজ জীবনে কোন্ ধরণের সুস্পষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ?

৯) বিপ্লব কি কি বড় বড় সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে ?

১০) আরব দেশগুলো ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর ব্যাপারে ইরান কি দৃষ্টিভংগী পোষণ করে ?

১১) রাশিয়ার পরিকল্পনা কি ? সে কোনো সশস্ত্র আক্রমন করার সংকল্প পোষণ করে কিনা ? রুশ ইরান সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ে ?

১২) ইমাম খোমেনীর পরে কি হবে ?

এ প্রশ্নগুলো আলোচনা করার জন্য আমার সফরকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এক, সফরের বিবরণী আর দুই, সফরের ফলাফল। কিছু প্রশ্নের জবাব সফর বিবরণীর মধ্যে এসে যাবে আর বাকি প্রশ্নের জবাব সফরের ফলাফলের মধ্যে আলোচিত হবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী আমরা ইরান এয়ারের মাধ্যমে তেহরান পেঁছলাম। মেহরাবাদ বিমান বন্দরে নেমে দেখলাম চতুর্দিকে ইমাম খোমেনীর ছবি ও তাঁর বাণী। এ ছাড়া কুরআনের আয়াত ও তার ভিত্তিতে তৈরী বিভিন্ন শ্লোগানও চারদিকে ছড়ানো। এসবগুলো এমনভাবে চারদিকে সাঁটানো ও ঝুলানো হয়েছে যে, কোনো দেয়াল, থাম, লাইট পোষ্ট, দরজা, জানালা, যেদিকে দৃষ্টি যাবে সেদিকেই বিপ্লবের কোনো না কোনো বাণী আপনার চোখে পড়বেই। পাসপোর্ট ও মালপত্র চেকিংয়ের ব্যাপারে গতি যথেষ্ট মন্থর দেখে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। আল্লাহ মালুম কত ঘন্টা এখানে থাকা লাগে। জনৈক মেজবানকে নীচু স্বরে এক্ষেত্রে উন্নত সংগঠন ব্যবস্থা ও বৈপ্লবিক কার্যক্রমের অভাবের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি যা বললেন তা হচ্ছে মোটা-মুটি এই ঃ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মচারীদের পরিবর্তে বেশীর ভাগ কাজ পাসদারান (বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী)-এর সাহায্যে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। এছাড়া যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীন গোলযোগের কারণে চেকিংয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হচ্ছে। যাক, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আমাদের এগার জনের গ্রুপের বিশেষ মেহমানদের চেকিং দেড় ঘন্টায় শেষ করা হলো।

হোটেল হিলটনের উদ্দেশ্যে আমরা বাসে উঠলাম। হোটেলটির নতুন নাম রাখা হয়েছে হোটেল ইস্তিকলাল। বিমান বন্দর থেকে দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। পথের দু'পাশে আঁধার। চারদিকে আঁধারের সমুদ্র। শীত প্রচন্ড। বাইরে তুষারপাত হচ্ছিল। গাড়ীর আলো গভীর আঁধারের বুক ভেদ করতে পারছিলনা, কয়েক গজ দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। জনৈক ইরানী মেজবান বললেন ঃ যুদ্ধের কারনে আজকাল এমনিতেই আলো কম করা হয়,

www.nagorikpathagar.org

তার ওপর আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযমী হচ্ছি। 'শাহ ইয়াদ'—বর্তমানে এর নাম রাখা হয়েছে 'ময়দানে আযাদী'—সেখানে কিছুটা আলো দেখলাম। শুনলাম বিপ্লব বার্ষিকীর উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য তাকে বিশেষভাবে সজ্জিত ও আলোকিত করা হয়েছে। এ বিশাল দৈত্যের মতো মাথা উচু করে দাঁড়ানো ইমারতটি শাহ ইরান তৈরী করেছিলেন তার রাজ বংশের আড়াই হাজার বছরের রাজত্বের উৎসব পালনের জন্য। এ ইমারতটির চারপাশের বিরাট ময়দানে তাঁর রাজমুকুট ও সিংহাসনের শান শওকত ও শক্তিমত্তার প্রদর্শনী করেছিলেন। বিপুল গর্বভরে তা দেখিয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মানুষকে। কিন্তু আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যেখানে তিনি ইমারতটির নাম দিয়েছিলেন 'শাহ ইয়াদ' অর্থাৎ বাদশাহদের স্মৃতি রক্ষক আর প্রকৃত পক্ষে মিসরের পিরামিডের মতোই তা তার নির্মাণ কারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সেখানে আজ তার শিখরে পত পত করে উড়ছে বিপ্লবের পতাকা। কোনো রাজা বাদশাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করার পরিবর্তে সে আজ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির মাধ্যমে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে যাচ্ছে। 'মুতাকাব্বিরীন'দের তাকাব্বুর অহংকারের প্রদর্শনী করার পরিবর্তে এখন সে 'মুসতাদ'আফীন'দের—দুর্বল ও সর্বহারাদের বিজয় বার্তা স্বগর্বে ঘোষণা করে যাচ্ছে। এ বিশাল ইমারতটি দেখলে মনে হয় এটি আল কুরআনের—ফা'তাবিরু ইয়া উলিল আবসার—'বুদ্ধিমানরা শিক্ষা গ্রহণ করো'—আয়াতটির মূর্তিমান ব্যাখ্যা।

হোটেলে পৌঁছেও আর একবার বিমান বন্দরের মতো আমাদের তালাশী নেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর আমরা জানলাম, স্বাধীনভাবে আমরা কোথাও যেতে পারবোনা। কারণ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার তাগিদে মেহমানদেরকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নাকি এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অবশ্য পরিস্থিতির নাজুকতা আমরা কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিলাম। তাই চলাফেরার ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণকে আমরা নিজেদের জন্য ভালোই মনে করলাম। এতবড় হোটেলটার নির্জনতা তখন আমাদের কাছে প্রেত পুরীর মতো মনে হচ্ছিল।

রাত এগারটায় ডাইনিং হলে আগামী দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হলো। সকাল ৮টায় ইমাম খোমেনীর সাথে সাক্ষাত। ক্যামেরা, ঘড়ি ও কলম সব যার যার কামরায় রেখে যেতে হবে। নির্দেশ মোতাবিক পর দিন সকালে আমরা সবাই ঐ "অস্ত্র গুলো" ছাড়াই বিপ্লবের নায়ক ইমাম খোমেনীর সাথে সাক্ষাতে বের হলাম। ইমাম তেহরানের এক প্রান্তে খিয়াবানে হামীদ হাসানীতে একটি অনাড়ম্বর এবং তুলনামূলকভাবে বড় ও বিস্তৃত বিল্ডিংয়ে থাকেন। আশেপাশের বাড়ীগুলো হয় খালি করে দেয়া হয়েছে আর নয়তো তা পাসদারানদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যথারীতি আবার কড়া তল্লাশীর পর আমরা বাসে উঠলাম। পথে শ্লোগান আর জনতার মিছিল পেরিয়ে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছিলাম। বাস থেকে নেমে একটি দীর্ঘ ও যথারীতি সাপের মতো পেঁচানো পথে আমরা দু'জায়গায় দেহ তল্লাশীর পর এমন একটি হল ঘরে এসে পেঁছিলাম, সেখানে ঘরের মেঝেয় শতরঞ্জি বিছানো ছিল। সামনে পেছনে উভয় দিকে ব্যালকনি। ডান-দিকের ব্যালকনিতে একটি চেয়ার বসানো। তার সাথে মাইক্রোফোন ফিট ছিল। তার ভেতরের দিকে দুটি দরজাও ছিল। এ দরজা দুটি দিয়ে ইমাম খোমেনী ও তাঁর রক্ষী দল বের হন। সামনের ব্যালকনিতে টেলিভিশন ক্যামেরা ফিট করা ছিল। তার পেছনে পাসদারান (বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী) লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইমাম খোমেনীর আগমনের পূর্বে বিভিন্ন শ্লোগান ও সংগীত তরংগে হলটি গমগম করতে থাকলো। ব্যালকনি থেকে এক ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। যে শ্লোগান গুলো সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ও বার বার দেয়া হচ্ছিল সেগুলো হলো ঃ

"মুর্গে বার যিদে বেলায়েতে ফকীহ।" অর্থাৎ বেলায়েতে ফকীহ বিরোধীরা ধ্বংস হোক।

"মুর্গে বার আমেরিকা"—আমেরিকা ধ্বংস হোক।

"মুর্গে বার শোর্দী"—সোভিয়েত রাশিয়া ধ্বংস হোক।

"মুর্গে বার ইসরাইল"—ইসরাইল ধ্বংস হোক।

"মুর্গে বার" এই শ্লোগানের আওতায় ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, জর্দানের বাদশাহ হোসাইন ও মিসরের আনোয়ার সাদাতকেও মাঝে মাঝে শামিল করা হচ্ছিল। অথচ আনোয়ার সাদাত বহুদিন আগেই মুর্গে (মৃত্যু) লাভ করেছেন। আরেকটি শ্লোগান বারবার দেয়া হচ্ছিল। সেটি হলো ঃ

"লা-শার্কীয়্যা লা-গার্বীয়্যা আস্সাতরা ইসলামীয়্যা"—অর্থাৎ আমরা পূবের নই, পশ্চিমের নই, আমাদের বিপ্লব হচ্ছে ইসলামী বিপ্লব।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা কালেমা তাইয়েবা, নামায ও শ্রমের মাহাত্ম সম্পর্কে গান পেশ করলো। ছোট ছোট মেয়েদের চমৎকার পোশাকও পর্দার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই ছিল। তাদের কপালের অর্ধেক, থুতনীর অর্ধেক এবং গালের অর্ধেক ছাড়া বাকী সারা শরীর কাপড়ে ঢাকা ছিল। এটিই বর্তমানে ইরানের ছোট-বড়-যুবতী-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সমস্ত মেয়েদের পোশাক হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

ইমাম খোমেনীর আগমন বার্তা ঘোষিত হবার সাথে সাথেই শ্লোগান ও গানের মধ্যে নতুন জোশ ও প্রাণ সঞ্চার হলো। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও বিশৃংখলা ও অরাজকতা ছিলনা। আওয়াজের মধ্যে এত বেশী সামঞ্জস্য ও

www.nagorikpathagar.org

একাত্মতা ছিল যে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই সুরের বিপুল তরংগ সৃষ্টিতে কোথাও বাধা হচ্ছিল না। ইমাম খোমেনী আবির্ভূত হলেন। সংগে সংগে শ্লোগানের বন্যা বয়ে গেলো। তিনি মুচকি হেসে সংযত গাম্ভীর্যের সাথে দু'হাত উঠালেন এবং বিশেষ ভংগিতে শ্লাগানের জবাব দিতে দিতে নিজের আসনে এসে বসলেন। তেলাওয়াতে কুরআনের পর তিনি আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। তাঁর লাল-সাদা ও সুস্থ সবল শরীর দেখে পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো তাঁর ভীষণ অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার যে খবর ছড়িয়ে যাচ্ছে তার অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাঁর চলাফেরা ও কথাবার্তায়ও কোনো প্রকার দুর্বলতা ছিল না। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল ঃ

"কুরআন ও ইসলাম আজ সর্বত্র মজলুম। তাদের কথা আমরা আজ ভুলে গেছি। কুরআন বলেছিল ঃ তোমরা পরস্পর বিরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়োনা। তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। দুশমন তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আজ নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। ইসরাইল তার রাজ্যের সীমানা বাড়াবার লালসায় অন্ধ হয়ে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরা তার মোকাবিলায় দুর্বলতা ও অনৈক্যের শিকার হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ মজলুম মুসলমানের আওয়াজ শুনে যে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না যায় সে মুসলমান নয়। আমি সমস্ত মুসলমান ও তাদের সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ঃ মজলুম মুসলমানদেরকে ইসরাইল ও বড় শক্তিগুলোর আক্রমণ থেকে বাঁচান। হে মুসলমানরা, ইসলামকে মজলুমী ও অধীনতা থেকে বাঁচাও! আফগানিস্তানের মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমেরিকা হোক বা রাশিয়া এরা সবাই মুসলমানদের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের জুলুমের হাত কেটে ফেলো। ইসলাম নিছক আযান, নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াতের নাম নয়। তার রাজনৈতিক বিধানের প্রতি নজর দাও। ইসলাম আমাদেরকে হুকুম দেয় ঃ মুসলমানদের ওপর যারা আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে লড়ো। ইরানের নিজের কোনো গুরুত্ব নেই। আসল গুরুত্ব হচ্ছে ইসলাম, মুসলমান ও এই দুনিয়ার। যদি আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হয় তাহলে এরও কোনো গুরুত্ব নেই। ইসলামকে জীবিত ও মাথা উঁচু করে থাকতে হবে।

"আল্লাহর নবীগণও ইমামগণ ইসলামের হেফাজত ও বিজয়ের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সবচাইতে কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। খাদ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা 'মুসতাদ আফীন'দের (গরীব ও অনুন্নত শ্রেণী) কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের জন্য তিন বছরের স্বল্প

www.nagorikpathagar.org

সময়ে যা করেছি বিগত ৫০ বছরে শাহী ও মার্কিন আমলে তা সম্ভব হয়নি। আমাদের বিরুদ্ধে ধ্বংস করার অভিযোগ করা হচ্ছে। আমরা ইরানের নয়, মুস্তাকাব্বরীনদের (উচ্চবিত্ত ও ধনী শ্রেণী) কোমর ভেঙে দিয়েছি। ইমাম খোমেনী ইরাকের সাথে যুদ্ধের কথাও বলেন।"

ভাষণ শেষ করে ইমাম খোমেনী তাঁর বিশেষ ভংগীতে উপস্থিত জনতা ও মেহমানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্যালকনির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ফেরার পথে আমরা দেখলাম বিভিন্ন স্থানে শহীদদের ছবি হাতে নিয়ে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে জনতা এগিয়ে চলছে। আমাদেরকে বলা হলো, এরা শহীদদের পরিবার। কিছুক্ষণ পরে খোমেনী সাহেব এদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। সারা পথে ব্যানার, পোষ্টার, আয়াত ও বাণীর লিখনে ভরা দেয়াল, অলিগলি, দোকানপাট দেখতে দেখতে আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম। একজনের থেকে জানতে পারলাম, বিপ্লবের মর্মবাণী জিইয়ে রাখার জন্য পাবলিসিটি বিভাগে এই খাতে প্রতি বছর এক কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার পর বিকেল ২টায় প্রেসিডেন্ট খামেনীর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলাম। সেখানে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে শরিয়ত্নী আদালতের প্রধান আয়াতুল্লাহ মুসুভী ও তাঁর ৬জন সহযোগীর সাথে বৈঠক ছিল। তাদের সাথে আইন ব্যবস্থা, সুদমুক্ত অর্থনীতি, সাম্প্রতিক কালে প্রদত্ত শাস্তিগুলো, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের শাস্তি সম্পর্কে আলাপ হলো। বুঝলাম, এর মধ্যে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচারের ফসল। জনৈক বিচারপতি বললেন, শরীয়তের বিধি নিষেধের কারণে আমাদের তো হাত-পা বাঁধা। ১৪ বছরের একটি ছেলে ৪ জনকে খুন করেছিল। সে নিজের অপরাধ স্বীকারও করেছিল। কিন্তু আমরা বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে পারছিলাম না। গর্ভবতী মহিলার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া এবং তারপর তার দুধ খাওয়ার বয়স পার না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। মগরিবের নামাযের পর প্রেসিডেন্ট খামেনী আসলেন। প্রথমে তিনি ভাষণ দিলেন। তারপর প্রশ্নের জবাব। ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরে তিনি আসল জোর দিলেন কুরআন ও সুন্নাতের কর্তৃত্বের ওপর। তিনি এতদিনকার সাফল্যের বর্ণনা দিলেন এবং বিপ্লবের বাণী সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পেঁাছিয়ে দেবার উপদেশ দিলেন। রাতে হোটেলে ফিরে এসে জানলাম এশার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডঃ শরীয়ত মাদারী, ডঃ হাবিবী ও তাদের আর একজন সহযোগী আমাদের সাথে সাক্ষাত করবেন। তাদের বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্ব যথারীতি শেষ হলো।

www.nagorikpathagar.org

১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ছিল বিপ্লব দিবস। ময়দানে আযাদীতে ছিল সেদিন বিশেষ প্রোগ্রাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম লোকেরা শহীদদের ছবির প্লাকার্ড ও ফেস্টুন বহন করে হাজারে হাজারে দলে দলে ময়দানে জমায়েত হচ্ছে। এদিন ময়দানে অন্ততঃ ১০ লাখ লোকের সমাগম হয়। ইমাম খোমিনীর পুত্র আহমদ খোমেনী তাঁর পিতার পয়গাম পাঠ করে লোকদেরকে শুনান। মেয়েদের ও শহীদদের পরিবারবর্গের বসার জন্য আলাদাভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। সামরিক ব্যান্ডও পাসদারানের ব্যান্ডের তালে তালে ইসলামী বিপ্লবী সেনাবাহিনী, ওলামা, শ্রমিক, মহিলা, শিশু, পংগু ও সবশেষে সামরিক বাহিনীর ট্যাংক, গাড়ী প্রভৃতি প্যারেডে অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি দল জমিনে বিছানো আমেরিকার জাতীয় পতাকা দুপায়ে দলে অগ্রসর হয়। প্রথমদিকে আমেরিকার সাথে সাথে রাশিয়ার জাতীয় পতাকাও পদদলিত করা হচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের প্রতিবাদ ও ওয়াকআউটের ফলে তা উঠিয়ে নেয়া হয়। তবে "মুর্দাবাদ আমেরিকা" এর সাথে সাথে "মুর্দাবাদ শোরদী" (রাশিয়া) এর শ্লোগান শেষ পর্যন্ত জারী থাকে।

এই প্যারেড প্রায় বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত জারী থাকে। এর মাঝখানে এমন অনেক দৃশ্যও দেখেছি যাতে ইরানী জনগণের বর্তমান অবস্থা ও মন-মানসিকতা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন জনৈক শহীদের তিন বছরের মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "তোমার আব্বু কোথায় ?" সে পরম নিশ্চিন্তে জবাব দিলো ঃ "জান্নাতে।"

এক ব্যক্তি তার দুই শহীদ পুত্রের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শ্লোগানে অংশ গ্রহণ করছিল অত্যন্ত জোশ ও আবেগের সাথে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "দুই ছেলের মৃত্যুতে কি তোমার কোনো দুঃখ নেই ?" সে গর্বের সাথে বললো ঃ "দুঃখ কিসের ? শাহাদত তো প্রত্যেকটি মুসলমানের আকাংখা। আমার আকাংখাও এটিই। আমার আর কোনো ছেলে থাকলে আমি তাকেও কুরবানী করে দিতাম।" প্যারেডের মাঝে মাঝে যে শ্লোগান গুলো শুনা যাচ্ছিল সেগুলো হলো ঃ "আল্লাহু আকবর, খোমেনী রাহবর" —আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, খোমেনী আমাদের নেতা। এ ছাড়াও "মুর্দাবাদ আমেরিকা" ও "মুর্দাবাদ শোরদী" এরপর যে শ্লোগানটি সবচেয়ে বেশী শুনা যাচ্ছিল সেটি হলো ঃ "খোদায়া, খোদায়া, তা ইনকিলাবে মেহ্দী খোমিনী রা নিগাহদার।"—হে খোদা, হে খোদা, হযরত ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব পর্যন্ত খোমিনীর হেফাজত করো। বাচ্চা, বুড়ো, যুবক, প্রৌঢ় সবার শ্লোগানের ধরণ একই রকমের। যেন একটা ছাঁচ থেকে সব বের হয়ে আসছে—একেবারে যান্ত্রিক। সম্ভবতঃ তিন বছরের অনবরত প্রচেষ্টা তাদেরকে এভাবে যান্ত্রিক বানিয়ে দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

শুক্রবার জুমার নামায পড়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গেলাম। সেখানে জুমার জামায়াত হয়। নামায পড়ান জাতীয় পরিষদের স্পীকার হাশেমী রাফসানজানী। বাস আমাদের নিয়ে সেখানে চারদিকে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু কোথাও অযু করার জন্য পানি পাওয়া গেলনা। ফলে আমরা হোটেলে ফিরে এসে এখানেই নামায পড়ে নিলাম।

১৩ই ফেব্রুয়ারী আমরা দৈনিক কায়হান ইনটারন্যাশনালের অফিস ও প্রেস দেখতে গেলাম। এ প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৬টি পত্রিকা বের হয়। কায়হান ইংরেজী, আরবী ও ফারসীতে প্রকাশিত হয়। শাহের আমলে কায়হান ফারসীর প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার। বর্তমানে তা ৪ লাখে পৌঁছে গেছে। কায়হান শিশু সংস্করণ এর প্রচার সংখ্যায় ১৫ হাজার থেকে বর্তমানে ৩ লাখে পৌঁছে গেছে। শাহের আড়াই হাজার বর্ষপূর্তি উৎসবের সময় এ পত্রিকার জন্য জার্মানী থেকে এক সংগে ৩২ পৃষ্ঠায় দশটি রং ছাপার সর্বাধুনিক মডেলের মেশিন আনা হয়। এ মেশিনের সাহায্যে এখন বিপ্লবের সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।

পরদিন রোববার আমরা বিখ্যাত ইভিন (EVIN) কারাগার দেখতে গেলাম। এ কারাগারটি উঁচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এ কারাগারটি ছিল সাভাক (শাহের গোপন গোয়েন্দা বাহিনী) এর নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। এখানে হাজার হাজার মানুষ তাদের হাতে কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বর্তমানে এ কারাগারের পরিচালক হচ্ছেন জনাব লাজোরী। তিনি নিজেই এখানে ১৪ বছর কারাভোগ করেছেন। খালখালির স্থলাভিষিক্ত ও বর্তমান প্রসিকিউটার জেনারেল আয়াতুল্লাহ গীলানী এখানে এক ভাষণে বলেন, বিপ্লবের পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিচারের মাধ্যমে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞালাভ অথবা সংঘর্ষ চলাকালীন মৃত্যুবরণকারী লোকের সংখ্যা সাতশোর বেশী হবেনা। এদের বেশীর ভাগ সন্ত্রাসবাদী প্রতি-বিপ্লবী। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে আমাদের নিজেদের লোকেরাও রয়েছে। শাহের আমলে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল বিনা অপরাধে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রেসের বিবেক তখন জাগেনি। কিন্তু আজ সন্ত্রাসবাদীদের নিহত হবার খবর শুনে তাদের মানবতাবোধ জেগে উঠেছে। তারা তারস্বরে চীৎকার করে আকাশ মাথায় করে নিচ্ছে। 'মুজাহিদীনে খালক' এর জন্য যে সব মেয়েরা কাজ করেছিল তাদের বিচার প্রণালী ও অপরাধের স্বীকারোক্তি সম্বলিত ফিল্ম আমাদেরকে দেখানো হলো। বিপ্লবীরা মুজাহিদীনে খাল্‌ক কে বলে মুনাফিকীনে খাল্‌ক। আমাদেরকে যখন মুনাফিকীনদের কারাগার দেখাবার কথা বলা হলো তখন আমরা একটু অবাকই হলাম। পরে এর অন্তর নিহিত অর্থ প্রকাশ হবার পরে আমরা বেশ মজা পেলাম। এখানে বহু ছেলে

www.nagorikpathagar.org

কয়েদীকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদেরকে কোন্ অপরাধে এখানে আনা হয়েছে? জবাবে তাদের অধিকাংশই বললো, আমরা জানিনা। কেউ কেউ তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি পড়ে শুনালো এবং যারা তাদেরকে এ পথে এনেছিল তাদের ওপর লানত বর্ষণ করলো। কিশোর কয়েদীদেরকে বেশ ভালো অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। কারাগারের একটি বিরাট হলের মধ্যে মসজিদ ও পাঠাগার বানানো হয়েছে। এখানে যথারীতি শিক্ষাদান করা হয় এবং পড়ার জন্য বইপত্র দেয়া হয়। এ বিভাগের পরিচালক তাঁর বক্তৃতায় বললেন, আমরা কারাগারকে শিক্ষায়তনে পরিবর্তিত করে দিয়েছি। এখানে আটককৃত অধিকাংশ ছেলেকে নিছক ভুল বুঝাবুঝির কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা জন্মালো। কারণ, তাদের চেহারা ও চলাফেরা থেকে অপরাধীর ভাব ফুটে উঠছিল না।

১৫ ফেব্রুয়ারী আমরা ইরান বিপ্লবের আসল কেন্দ্র ও উৎসভূমি কুম পৌঁছলাম। ২৫ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুসিত এ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শহরটিতে এক লাখ ওলামা ও শিক্ষকের বাস। প্রথমে আমরা এমন এক জনের ঘরে গিয়ে উঠলাম যার দুটি জোয়ান ছেলে বিপ্লব চলাকালে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের একজন ছিল বিবাহিত। তার স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। সে এক পত্রে তার স্ত্রীকে অসিয়ত করেছিল ঃ ছেলে জন্ম নিলে তার নাম রাখবে হোসাইন এবং তাকেও লালন পালন করে বড় করে শাহাদতের জন্য তৈরী করবে। এখান থেকে আমরা পাসদারানের হেড কোয়ার্টারে এসে সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে যোহরের নামাযের পর তিনটি নিকটবর্তী গ্রামে গেলাম। সেখানে জিহাদী জীবন যাত্রার নমুনা দেখলাম। যুব সংগঠন পাসদারান গ্রামে পাকা বাড়ী তৈরী, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং স্কুল, ডিসপেনসারী ও রাস্তাঘাট নির্মাণে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে আমরা কুমের ঐতিহাসিক মাদ্রাসায় পৌঁছলাম। এটি এক হাজার বছরের প্রাচীন মাদ্রাসা। মাদ্রাসাটির বিস্তার অনবরত বেড়ে যাচ্ছে। এখানে লাইব্রেরীতে ২৫হাজার দ্বীনী কিতাব রয়েছে। এর কাছেই ইমাম রেযার বোন হযরত মাসুমার রওযা। রওযার আশেপাশে আল্লামা তাবাতাবাই ও অন্যান্য বড় বড় আলেমগণের মাযার। বাইরের দিকে একটি বিরাট ময়দান। এটাকে মজলিস ও মহফিল অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করা হয়। এর পেছনে কবরস্থান। এখানে আমাদের নির্ধারিত প্রোগ্রাম আয়াতুল্লাহ মাশকিনীর সাথে। তিনি ভূমি সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং খোমিনী সাহেবের নিকটতম সাথী। আমাদের প্রোগ্রাম আকস্মিক ও সংক্ষিপ্ত হবার কারণে আমরা এখানে আয়াতুল্লাহ মুনতাযিরী ও আয়াতুল্লাহ গুলপায়েগানীর সাথে সাক্ষাত করতে পারিনি। তবুও আমাদের যে সব সাথী

www.nagorikpathagar.org

তাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন তাদের কাছ থেকে সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করেছি। এভাবে ইরান বিপ্লবকে সরচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, বিপ্লবের কার্যক্রম গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ এবং বিপ্লবের নেতা ও কর্মীদের সাথে সাক্ষাত ও আলোচনা করার পর আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, বর্তমান ইরানকে আমি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি এবং ইরানের বর্তমান কার্যক্রম অন্যদেরকে বুঝাবার ব্যাপারে ইনশা আল্লাহ আমার এ অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিত প্রমাণিত হবেনা।

ইরান বিপ্লব ঃ কি হারিয়েছে, কি পেয়েছে

ইরানের ইসলামী বিপ্লব তিন বছর পার হয়ে এখন চার বছরে পড়েছে। এ বিপ্লবের ফলাফল ও কার্যক্রম পর্যালোচনা আগের চাইতে এখন আরো বেশী বাস্তব ভিত্তিক হবে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিপ্লব তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে। এক, নেতৃত্বের পরিবর্তন। দুই, বিপ্লবের স্থিতিশীলতা অর্জন। তিন, সমাজ পরিবর্তন।

প্রথম পর্যায়টি ইরান সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়টিও সে সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে চলছে, যদিও এ ব্যাপারে তাকে ভেতর-বাইরের অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর স্থিতিশীলতা ও প্রভাবশালী নেতৃত্বের তুলনায় তৃতীয় পর্যায়টিতে সে বিস্ময়কর কার্যবিলী সম্পাদন করেছে। আজ আমাদের মনে যে প্রশ্নগুলো জেগেছে তার মধ্যে মূল প্রশ্নটি হচ্ছে, ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান কি হারিয়েছে ও কি পেয়েছে ? আর যা কিছু পেয়েছে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু ?

এ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। ইরান বিপ্লব ইতিহাসের এমন একটি সর্বাত্মক, জটিল ও অভিনব বিপ্লব, ইতিহাসে যার কোনো নজীর নেই। এ ধরণের ঘটনাবলী পর্যালোচনা ও যাচাই পরখ করার এবং এ সমপর্কে কোনো অভিমত গড়ে তোলার সমস্ত নীতি নিয়ম ও মানদন্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। "আকল হুনুয মাহ্বে তামাশায়ে লাবে বাম আভী"—বুদ্ধি বিস্ফারিত নেত্রে বিস্ময়ে হতবাক এখানে। "আতশে নমরুদ সে' বেখাতর কোছ্তা হ্যায় ইশ্ক"—নিঃশঙ্ক চিত্তে নমরুদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে ইশ্ক তার কান্ড কারখানা দেখে বুদ্ধি সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। বুদ্ধি বার বার তাকে পাগল আখ্যায়িত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পাগলপনার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তার গ্রন্থীগুলোর জটিলতা আরো বেড়ে গেছে। সে ঈর্ষা ও আক্ষেপের সম্মিলিত আবেগে আপ্লুত হয়ে নিজেই পাগল হবার জন্য দোয়া করতে শুরু করেছে।

www.nagorikpathagar.org

ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে যথাযথভাবে অনুধাবন করার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে এই যে, এ বিপ্লবকে আমরা প্রায়ই বিভিন্ন বিদ্বিষ্ট ও স্বার্থান্ধ মনোভাবের আলোকে বিচার করতে বসে যাই। ইসলামী দুনিয়ায় এ বিপ্লবকে সাধারণভাবে আরব-আজম ও শিয়া-সুন্নীর দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। কমিউনিষ্ট বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক ক্যাম্পের সাথে সম্পর্কিত লোকেরা কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মতবাদ ও আদর্শের আলোকে বিচার করে একে ধনী ও দরিদ্রের সংঘাত, ইতিহাসের দ্বান্দিক বস্তুবাদ ও সর্বহারার বিপ্লবের ছাঁচে ফিট করার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য বাসীরা বোকার মতো চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে এ বিপ্লবের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে। এ সমগ্র ব্যাপারটিকেই তারা কেবলমাত্র জাগতিক শক্তি ও দুর্বলতার আওতায় রেখে বিচার করছে। তারা প্রত্যেকে নিজের জায়গায় নিজের মতোই চিন্তা করেছে। তারা মনে করছে, আমরা তো শাহের হেফাজতের জন্য অস্ত্রের পাহাড় বানিয়ে দিয়েছিলাম, সাভাকের মতো শক্তিশালী গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনী এবং এ ছাড়াও আরো বহু গোপন গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করে দিয়েছিলাম, পাশ্চাত্যবাদী স্বার্থান্ধ শ্রেণীর প্রতিপত্তি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মজবুত দেয়াল তৈরী করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এসব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে একদল কাঠমোল্লা ও তাদের সাংগ পাংগরা। তারা ভাবতে পারছেনা তাদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন কি ত্রুটি থেকে গিয়েছিল যার ফলে এমন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো। আমেরিকা ও তার পুঁজিবাদী গোষ্ঠী কেবলমাত্র নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত। ইরানে তাদের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হবার পর এখন তারা দুনিয়ার আর যেখানে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেগুলোকে কিভাবে অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য করা যায় এ চিন্তা ছাড়া আর কোনো কথা চিন্তাই করতে পারছেনা। ইরানের ব্যাপারে তাদের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ হচ্ছে খোমিনীর অসুস্থতা ও মৃত্যু সম্পর্কে। এ ব্যাপারে তারা দস্তুরমতো আহাম্মকের বেহেশতে বাস করছে বলা যায়। তারা মনে করছে ওদিকে খোমিনীর দুচোখ বন্ধ হবে আর এদিকে ইরান আবার টুপ করে তাদের ঝুলিতে এসে পড়বে। অন্যদিকে রাশিয়া আর একটা নতুন দেশ দখল করার স্বপ্নে বিভোর। কখন তার এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এ চিন্তায় সে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত।

ইরানের বর্তমান অবস্থার সঠিক পর্যালোচনা করতে হলে আমাদেরকে ইরান বিপ্লবের ব্যাপারে নিজেদের মনকে সব রকমের কলুষতা মুক্ত করতে হবে। ইরানকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-মতবাদ ও স্বার্থের মানদণ্ডে বিচার করলে চলবেনা। বরং ইরানকে বিচার করতে হবে তার নিজের চিন্তা-আকীদা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে। আমরা যখন ফরাসী ও রুশ বিপ্লব পর্যালোচনা করি তখন আমাদের মনে নিজেদের চিন্তা-আকীদার সামান্যতম গন্ধও থাকেনা।

www.nagorikpathagar.org

যে চিন্তা ও মতবাদ সে দেশগুলোর সংঘটিত বিপ্লবকে শক্তিদান করেছে তারই আলোকে সেখানকার বিপ্লব ও বিপ্লব পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়। ইরান বিপ্লবের ব্যাপারেও এ নীতি অবলম্বন করলে আর কোনো সমস্যাই দেখা দেয়না। এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য যে, ইসলামের শিয়া আকীদাই এ বিপ্লবের মূল পরিচালিকা শক্তি। কাজেই এই আকীদা-চিন্তার আলোকে এ বিপ্লবের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা হওয়া উচিত। আমাদের নিজেদের আকীদা চিন্তা যাই হোক না কেন ইরান বিপ্লবের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন মনে করতে হবে। আর শিয়া আকায়েদের মধ্যে যাই থাকনা কেন এক্ষেত্রে তার সমালোচনাও অপ্রাসংগিক ও অবৈধ। আমাদের বিচার্য হচ্ছে, ইরানে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে বিপ্লবী শক্তিগুলোর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ কি ভূমিকা পালন করেছে ? এ বিপ্লব সংঘটিত হবার দশ মাস আগে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে, যখন এ বিপ্লবের সাফল্যের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি এবং যখন শাহের কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যাকাশে বিরাজ করছিল ও তাঁর পতনের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি তখনই, আমরা এ বিপ্লবের পক্ষে আওয়াজ বুলন্দ করেছিলাম। তখন ইরানের বিপ্লবী শক্তিগুলির আভ্যন্তরীন নেতৃত্ব ছিল আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারীর হাতে। আমরা ইরানে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের একটি অংশ এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করতাম। একথা আমাদের কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ছিল যে, শিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশে যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে তা নিঃসন্দেহে শিয়া আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। কাজেই আমরা শিয়া বাদশাহের পরিবর্তে শিয়া জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ইসলামী সরকারকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। দুনিয়ার সমস্ত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এ দৃষ্টিকোন থেকেই ইরানী জনগণকে সমর্থন জানিয়েছিল।

এ বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার পর এর ফলাফল দেখে সারা দুনিয়া হতবাক হয়ে গেছে। আমাদের মতে এ বিপ্লবের নিম্নোক্ত দিকগুলো অস্বাভাবিক গুরুত্বের দাবীদার ঃ

(১) ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তি ছিল ধর্মদ্রোহিতার ওপর। অন্যদিকে ইরান বিপ্লবের ভিত গড়ে উঠেছে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের ওপর। তওহীদ বিশ্বাস ও ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে প্রবর্তিত করার সংকল্পই এ বিপ্লবের সার নির্যাস। নিছক অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধার এর চালিকাশক্তি নয়। এ বিপ্লব উৎসারিত হয়েছে ঈমানী শক্তির উৎস থেকে এবং এর ফলে বস্তুবাদের এই প্রাধান্যের যুগে বস্তুবাদী উপকরণের ওপর এ বিপ্লব ঈমানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

(২) খিলাফতে রাশেদার পর থেকে মুসলিম সমাজ রাজতন্ত্রের ছাতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে আসছে। আমাদের ইতিহাস রাজ দরবার ও মাদ্রাসার দীর্ঘকালীন সংঘাতের ইতিহাস। মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম রাজদরবারকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুগত রাখার জন্য অনবরত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। আবার রাজ দরবার দ্বীনকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সীমানার মধ্যে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ভালো ও খারাপ বাদশাহদের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংঘাত কখনো ছিল কম আবার কখনো ছিল বেশী। কিন্তু ইতিহাসের কোনো যুগ এ সংঘাত মুক্ত থাকেনি। এভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে রাজতন্ত্র সুস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিমধ্যে বহু মুসলিম দেশে উপনিবেশবাদী ব্যবস্থার অবসানে পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রচলন হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত লোকেরাই সর্বত্র ক্ষমতার মসনদ দখল করে। বর্তমানে বহু মুসলিম দেশে বাদশাহদের পরিবর্তে ডিকটেটর ও সামরিক একনায়করা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। আর যেসব দেশ উপনিবেশবাদের কবলে আসেনি সেখানে যথারীতি রাজতন্ত্র কায়েম রয়েছে। ইরান দুনিয়ার প্রথম মুসলিম দেশ যেখানে মাদ্রাসার উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ইসলামের পতাকাতলে একটি পূর্ণাংগ গণবিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং রাজতন্ত্র ও ডিকটেটরশীপ শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে।

৩) ইরানের ইসলামী বিপ্লবের আর একটি বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, এ বিপ্লব পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী নওজোয়ান ও মাদ্রাসার উলামায়ে কেরামকে একই প্লাটফরমে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতামূলক সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে পরস্পরের সহযোগী বানিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা উলামায়ে কেরামের নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছে। তারা নিজেদেরকে দ্বিতীয় সারিতে রাখতে রাজি হয়েছে।

৪) খোমিনীর নেতৃত্বে ইতিহাসের সম্পূর্ণ একটি অভিনব দৃশ্য দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। একদল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের ঈমান, ঐক্য ও সংকল্পের জোরে এদং শাহাদতের জযবায় উদ্দীপিত হয়ে দুনিয়ার একটি বৃহত শক্তিকে পরাজিত করেছে। এ নতুন অভিজ্ঞতাটি দুনিয়ার সমস্ত ইসলামী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। তাদের হিম্মত বেড়ে গেছে। দুনিয়ার সমগ্র মজলুম-নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর বুকে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তাদের হতাশা ও নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যাচ্ছে। প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের নতুন প্রাণ বন্যায় তাদের হৃদয় প্লাবিত হয়েছে। তাদের মনে জাগছে সাফল্যের নতুন আশা।

www.nagorikpathagar.org

৫) ইরান বিপ্লব বৃহত শক্তি বিশেষ করে আমেরিকার দম্ভ চূর্ণ করার এবং ছোট দেশগুলোর স্নায়ুর ওপর থেকে তার অসদ্ভাবিক চাপ কমাবার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

৬) এতদিন ধর্মকে "রক্ষণশীল" বলে গালি দেয়া হতো এবং কমিউনিজমের দাবী ছিল একমাত্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমেই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। পশ্চিমের সেক্যুলার দুনিয়াও ধর্মকে কোনো রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। ইরান বিপ্লব উভয়কেই ঠান্ডা করে দিয়েছে। ইরান বিপ্লব ইসলামের রাজনৈতিক শক্তির এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিশ্রুতি শীল প্রদর্শনী করেছে যার ফলে সমস্ত মনগড়া মতবাদের তেলেসমাতি হাওয়ায় উবে গিয়েছে। বর্তমানে ইরান বিপ্লব ও আফগানিস্তানের জিহাদ ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের ধারণাই পাল্টে দিয়েছে। তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থই নিশ্চিতভাবে তাদের দৃষ্টিভংগি নির্ধারণ করবে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাদের বেশীর ভাগ ভুল ধারণার নিরসন হয়ে গেছে।

(৭) ইরান বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমিনী বর্তমান যুগে ইসলামের শত্রুদের মোলাবিলা করার এবং একই সংগে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চতুর মুখী লড়াই পরিচালনায় নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন। তাঁর মধ্যে দ্বীনী ইলম ও দূরদর্শীতা, ইসলামের বিজয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, কুরবানী, দৃঢ়তা, অবিচলতা, সরলতা, ভোগ বিমুখতা, নিজের নীতির ওপর অচলায়তন পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি, শত্রুর কলা-কৌশল বুঝবার ও সেগুলো যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়ার যোগ্যতা, রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তিকে ভয় না করার মতো মজবুত ও অপরাজেয় স্নায়বিক শক্তি একত্রিত হয়ে গেছে। এসবের কারণে তিনি নিজের যুগের সব চেয়ে সফল রাজনৈতিক নেতা গণ্য হয়েছেন। তাঁর জানী দুশমনরা সহ সারা দুনিয়া তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৬৩ সালে তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেন ১৬ বছরের অনবরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাকে সাফল্যের মনযিলে পেঁাছিয়ে দেন।

৮) বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল থেকে ইসলামী বিপ্লবের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু একমাত্র ইরানই সমস্ত বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এদিক থেকে বলা যায় ইরান প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের এই একটি দিকই তাকে বিশ্ব ইতিহাসের বিশিষ্ট আসন দান করেছে। ১৪ শো বছর পর মুসলমানরা আজ ইসলামের বিস্ময়কর

www.nagorikpathagar.org

শক্তির প্রদর্শনী ও তার বিজয় অভিযান দেখে হৃদয়ে শান্তি অনুভব করছে। জালেমের ওপর মজলুমের এত বড় বিজয়, তাও শুধুমাত্র ঈমানের শক্তি বলে, এর ওপর একমাত্র শাহের তল্পীবাহকরা এবং রাজতন্ত্র ও একনায়কত্বের ধ্বজাধারীরা ছাড়া আর কে না খুশী হয়েছে।

ইরান বিপ্লবের পক্ষে আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতার এদিক গুলো সামনে রেখে এবার এ মূল প্রশ্নে ফিরে আসুন, বিগত তিন বছরে ইরান কি হারিয়েছে ও কি পেয়েছে এবং যা কিছু পেয়েছে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু। এই সল্প সময়ে ইরান নিঃসন্দেহে অনেক কিছু হারিয়েছে এবং তার ভবিষ্যত ও শত বিপদের লক্ষ্য বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তবে সংগতভাবে এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা তার সাফল্যগুলো পর্যালোচনা করবো। এজন্য প্রথমে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো আলোচনা করতে চাই।

১) খোমিনীর নেতৃত্ব ছিল সকল বিতর্কের উর্ধে। তিনি ছিলেন ইরানী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু তিনি বৈধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য জনগণের আস্থা ভোট লাভ করা অপরিহার্য গণ্য করলেন এবং ৩১শে মার্চের রেফারেন্ডামের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব ও মর্যাদার সপক্ষে আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে তুললেন।

২) গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হলো। তারা যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করলেন তাকে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে তার পক্ষে জনগণের সম্মতি নেয়া হলো।

৩) সারা দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং মজলিসে শুশাবেরাত কায়েম করা হলো। এটি হচ্ছে দেশের আইন প্রণয়ন পরিষদ।

৪) তিন বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লব সংঘটিত হলো আর ১৫ই নভেম্বর শাসতন্ত্র প্রণয়নের সমস্ত পর্যায় সুচারু রূপে অতিক্রান্ত হলো। মাত্র ৯ মাসের মধ্যে শাসতন্ত্র পুরোপুরি তৈরী হয়ে গেলে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব হয়নি। অথচ অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল যে একে সহজেই "প্রতিকূল" গণ্য করে রেফারেন্ডাম, নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন—সব কিছু মুলতবী করার জন্য বৈধ হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা যেতো। দেশের বর্তমান ব্যবস্থা যে শাসনতন্ত্রের আওতাধীন তার বিশেষ বিশেষ কথাগুলো হচ্ছে

১) শাসনতন্ত্র অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাধারণের বোধগম্য। এতে মোট ১২টি অধ্যায় ও ১৭৫টি ধারা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

২) শাসনতন্ত্রের আদর্শিক ভিত্তি ২নং ধারায় সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র হবে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। (১২ জন ইমামের রেওয়ায়েতও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত)

৩) ৫ নং ধারা অনুযায়ী মেহদীর আবির্ভাব পর্যন্ত রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নির্বাচিত এমন একজন নেতার হাতে থাকবে যিনি হবেন ধর্মীয় নেতা, ন্যায়পরায়ণ ফকীহ, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, অবস্থার চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, সাহসী ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সমপন্ন। যদি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন এমন একজন নেতা না পাওয়া যায় তাহলে উপরোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী তিন বা পাঁচজন নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের "নেতৃ পরিষদ" (মজলিসে কায়েদীন) গঠন করা হবে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এ নেতৃত্ব ও প্রাধান্যকে পারিভাষিক অর্থে "বেলায়েতে ফকীহ" নাম দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এই বেলায়েতে ফকীহর নেতৃপদে আসীন আছেন ইমাম খোমিনী।

৪) দেশের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিয়ে প্রদেশ, শহর, জিলা ও গ্রাম স্তর পর্যন্ত সর্বত্র 'মজলিসে মুশাবেরাত' (পরামর্শ সভা) কায়েম করা হয়েছে।

৫) ১২ নং ধারায় ইসলামকে (জাফরী ইস্না আশারী) রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সুন্নীদের সমস্ত মযহাবকে তাদের ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

৬) যরথুষ্ট্রীয়, ইহুদী ও খৃষ্টান–কেবলমাত্র এ তিনটি ধর্মীয় সংখ্যা-লঘিষ্ঠের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৭) মাধ্যমিক স্কুল পর্যায় পর্যন্ত আরবী ভাষাকে আবশ্যিক গণ্য করা হয়েছে।

৮) হিজরী ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা হয়েছে। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন গণ্য করা হয়েছে।

৯) ৩১ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে তার প্রয়োজন মোতাবিক গৃহ প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

১০) কেন্দ্রীয় মজলিসে মুশাবেরাতের সদস্য ২৭০ জন। সংখ্যালঘুদের একজন করে সদস্য নির্বাচিত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে এবং কুরআন ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী।

১১) আইন প্রণয়ন যাতে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় সেজন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন ৬ জন আলেম ও ৬ জন আইন বিশেষজ্ঞ। মজলিসে মুশাবেরাত প্রণীত কোনো আইন এ উপদেষ্টা পরিষদের মঞ্জুরী ছাড়া গৃহীত ও প্রবর্তিত হতে পারবেনা। এ পরিষদই সাধারণ নির্বাচন ও রেফারেন্ডম পরিচালনা করবে।

www.nagorikpathagar.org

১২) দেশে কোনো অবস্থায় মার্শালিল' জারী করা যাবেনা। জরুরী অবস্থায় মজলিসের মঞ্জুরী সাপেক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সাময়িকভাবে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে, যা কেবল ৩০ দিনের জন্য প্রবর্তিত থাকতে পারে। এর চেয়ে বেশী সময়ের প্রয়োজন হলে সে জন্য আবার মজলিসের মঞ্জুরীর প্রয়োজন হবে।

১৩) কোনো বিদেশীকে মজলিসের মঞ্জুরী ছাড়া সরকারী পদে বা কাজে নিযুক্ত করা যাবেনা।

১৪) প্রদেশ গুলোর ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মজলিস তাদের প্রস্তাবাবলী ও পরিকল্পনা মঞ্জুর করবে।

১৫) প্রধান নেতা বা নেতৃমজলিসকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ঃ উপদেষ্টা পরিষদের আলেম ও অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন দান, আদালতের বিচারপতি নিয়োগ, চীফ অব জেনারেল স্টাফ নিয়োগ ও তার অপসারণ পাশদারানের প্রধান নিয়োগ ও অপসারণ, সুপ্রীম প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠন, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর তিন প্রধানের নিয়োগ, নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্টের নিযুক্তি, আদালত বা মজলিসের ফায়সালার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্টের অপসারণ প্রভৃতি। কায়েদ বা প্রধান নেতার পর প্রেসিডেণ্ট হবেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।

১৬) প্রেসিডেণ্ট প্রধান মন্ত্রীর মনোনয়ন দেবেন এবং মজলিস তার মঞ্জুরী দেবে। ক্যাবিনেট মজলিসের কাছে জবাবদিহি করবে।

১৭) সেনাবাহিনীর কোনো অফিসার কোনো আরদালি ও ড্রাইভারকে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কাজ করাতে পারবেন না।

১৮) সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল হবে সবচেয়ে বড় বিচার বিভাগ। আদালতের বিচারপতি নিয়োগ, তাদের অপসারণ এবং আদালত প্রতিষ্ঠা হবে তাদের দায়িত্ব।

১৯) শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার সম্বলিত একটি পূর্ণাংগ অধ্যায় ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এ অধ্যায়টি ২৩ টি ধারা সম্বলিত।

২০) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তিনটি শাখা যথা ঃ সরকারী, ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সাহায্য সম্বলিত হবে। (পরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে)

এ শাসনতন্ত্রের আওতায় প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়ে গেছে। তবে 'মজলিসে কিয়াদত' (নেতৃ পরিষদ) এখনো গঠন করা হয়নি। এটার প্রয়োজন হবে আয়াতুল্লাহ খোমিনীর পর অন্য কেউ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত না হলে (তবে এ ব্যাপারে আয়াতুল্লাহ মুনতাযিরীর সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট

www.nagorikpathagar.org

লাভের আশা করা হচ্ছে।) তবুও ইমাম খোমিনী তাঁর জীবদ্দশায় নেতৃ পরিষদ গঠন করে দিয়ে যাবার চিন্তা করছেন। বর্তমানে এজন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

এই শাসনতন্ত্রের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা যেতে পারে। এমন কি ইরানে কুমের উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ ব্যাপারে মত বিরোধ আছেও। কিন্তু এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কায়েম করাকে ইমাম খোমিনী কত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা হচ্ছে বিপ্লবের একটি ইতিবাচক দিক। ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রথমত প্রতিষ্ঠান কায়েম করাকে কোনো গুরুত্বই দেয়া হয়না আর যদি নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে কোথাও গুরুত্ব দেয়া হয়েই থাকে, তাহলে জনগণের রায় ও পছন্দ অপছন্দের কোনো তোয়াক্কাই না করে মনোনয়নের মাধ্যমেই এসব প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। ইরান এ ব্যাপারে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত কায়েম করেছে। এটা একটা সুন্দর ও উৎসাহ ব্যাঞ্জক পরীক্ষা নিরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান গুলির ফলে ইরানে নেতৃত্বের কোনো শূন্যতা দেখা যায়না। সমগ্র এ্যাসেম্বলী উড়িয়ে দিলেও এবং সমগ্র ক্যাবিনেট খতম করে দিয়েও নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের শূন্য স্থান পূরণ করা হয় এবং নতুন নেতৃত্ব পুরাতন নেতৃত্বের স্থান দখল করে। দুনিয়ার যেখানেই ইসলামী নেযাম প্রতিষ্ঠিত হবে তাকে এসব পর্যায় অতিক্রম করতেই হবে। তাই ইরানের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বড়ই গুরুত্বের দাবীদার।

বেলায়েতে ফকীহ ও তাকীয়া

ইরান বিপ্লবের পর ইমাম খোমিনী ইরানে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন তাঁর 'বেলায়েতে ফকীহ' কিতাবে তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইরানে বর্তমানে যেসব শ্লোগান জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ "মুরগে বার যিদে বেলায়েতে ফকীহ" অর্থাৎ বেলায়েতে ফকীহ বিরোধী যা কিছু, সব কিছুর ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক এবং এ ব্যবস্থার বিরোধী সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস হোক। এই 'বেলায়েতে ফকীহ'-এর দর্শন সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি।

নিছক আইনের কিতাব সমাজ সংস্কারের জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে মানবতার সংস্কার ও কল্যাণের মাধ্যমে পরিণত করার জন্য প্রবর্তনকারী শক্তির প্রয়োজন। আল্লাহ আইন নাযিল করার সাথে সাথে প্রবর্তনকারী শক্তি গঠনের হুকুম দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কুরআনের আকারে আমরা আইনের কিতাব লাভ করেছি এবং তিনি নিজে সে অনুযায়ী একটি সমাজ গঠন করে তাকে বাস্তবে প্রবর্তিতও করেন। বলাবাহুল্য, ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

আইনের প্রবর্তন কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা। এটা ছিল একটা চিরন্তন প্রয়োজন। এর ধারাবাহিকতা অবশ্যি বজায় থাকতে হবে। এজন্য এর কোনো একটি অংশও মুলতবী করা জায়েয নয় বরং এধরনের পদক্ষেপ সরাসরি ইসলামের বরখেলাফ প্রমাণিত হবে। ইমাম মেহদীর গায়েব হবার পর এক হাজার বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সম্ভবত তাঁর আবির্ভাবের জন্য আরো হাজার বছর সময় লাগতে পারে। তাহলে এই অন্তরবর্তীকালে ইসলামী বিধান কি মুলতবী থাকবে? লোকেরা কি যা ইচ্ছে তাই করে যেতে থাকবে? এভাবে কি ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হবেনা? যে ব্যক্তি মনে করে ইমাম মেহদীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার প্রয়োজন নেই সে আসলে ইসলামী বিধান প্রবর্তনের বিরোধী এবং সে ইসলামকে চিরন্তন ও কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

এই মূল কথাগুলো বলার পর ইমাম খোমিনী বলেছেন, বর্তমান সরকারগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে না দেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিও শরীয়ত উভয়ের দাবী। এ সরকারগুলো গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে। তারা আল্লাহর শরীয়তকে বাতিল করে দিয়েছে এবং সে স্থলে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ কারবার করে যাচ্ছে। মুসলমান যেখানেই থাক না কেন তাকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কারণ নবী ও ইমামদের পর এটা তাদের দায়িত্ব। যদি তারা এ কর্তব্য পালন না করে তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ইসলাম কেবলমাত্র ২শো বছরের জন্য এসেছিল। আর এখন তার কোনো প্রয়োজন নেই। একথা সত্য, ইমাম মেহদীর গায়েব হবার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে বা কারা হবেন সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দলীল আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আজ যে ব্যক্তির মধ্যেই শরীয়তের বিধান প্রবর্তনকারী শাসকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় অর্থাৎ যে ইসলামী আইনের জ্ঞান রাখে, মুত্তাকী ও ইনসাফ প্রবর্তন করার যোগ্যতা সম্পন্ন সে মুসলমানদের শাসক হতে পারে। যদি কোনো একব্যক্তির ওপর সবাই একমত হতে না পারে তাহলে ফকীহগণ ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ সবাই মিলেমিশে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। কারণ তাদের অধিকাংশই ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করার যোগ্যতা রাখেন।

ইমাম খোমিনী এই 'বেলায়েতে ফকীহ'কে দুভাগে ভাগ করেন। এক, 'বেলায়েতে তাকবীনী' (সোপর্দকৃত বা অনঢ় নেতৃত্ব)। দুই, 'বেলায়েতে এতেবারী' (তুলনামূলক নেতৃত্ব)। প্রথম বেলায়েতটি কেবলমাত্র ইমামদের জন্য নির্ধারিত। অন্য কোনো ব্যক্তি এ মর্যাদায় অভিসিক্ত হতে পারেনা। আর দ্বিতীয় বেলায়েতটি সবার জন্য। উম্মতের ফকীহগণ এই বেলায়েতের

www.nagorikpathagar.org

মর্যাদায় আসীন হতে পারেন। যদি কোনো ফকীহ ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত সংস্কার মূলক কাজ করেছিলেন তার সবগুলোই তাকে করতে হবে। এক্ষেত্রে ফকীহর আনুগত্য করা হবে জনগণের জন্য অপরিহার্য। খোমিনী এ প্রসংগে 'আল উলামাউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া'—আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিস—হাদীসকে যুক্তি হিসেবে পেশ করেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা আলেমদের জন্য ফরয। ইমাম মেহদীর আগমনের প্রতিক্ষায় তাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবেনা।

ইমাম খোমিনী বেলায়েতে ফকীহর যে ধারণা পেশ করেছেন তা শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত বেলায়েতে ফকীহর ধারণার বিরোধী। তিনি সাহসিকতার সাথে এ মত প্রকাশ করেছেন। যে ইমামের প্রতীক্ষায় সমগ্র শিয়া সমাজ হাজার বছর থেকে দিন গুণে আসছে। তার আগমণ পর্যন্ত অবস্থার গতানুগতিকতাকে স্বীকার করে নেয়া এবং তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা না করার যে ধারণা শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ইমাম খোমিনী তাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়িয়ে ফেলে দিয়েছেন। তিনি এই আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট "তাকীয়া" (নির্ভরতা) নামক আর একটি আকীদাকেও খতম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ইমামগণ ফকীহগণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাদের ওপর উম্মতের নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়েছে। কাজেই এখন ছোট বড় প্রত্যেকটা কাজের ব্যাপারে তাকীয়া করা উচিত নয়। শরীয়ত তাকীয়ার আংশিক অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম যখন বিপদের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তাকীয়ার কোনো বৈধতা থাকেনা। কোনো ফকীহকে যদি কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে আইন প্রণয়নে বাধ্য করা হয় তাহলে কি সে একথা বলে নিজেকে একাজে নিযুক্ত করতে পারে যে, "তাকীয়া" করা আমার ও আমার পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম।

ইমাম খোমিনী তাকীয়ার ব্যাপারে যে দৃষ্টিভংগী পোষণ করেছেন তা তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর সমগ্র চিন্তার খোলাসা হচ্ছেঃ ইসলামের বিজয়ের জন্য আমাদের সমস্ত আশা আকাংখাকে আমরা ইমাম মেহদীর সাথে বিজড়িত করেছি এবং বর্তমান তাগুতী ব্যবস্থার জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য যেভাবে তাকীয়া করে বসে আছি, তার কোনো বৈধতা ইসলামে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। ইসলামী বিপ্লব আমাদের নিজেদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেকটি বিরোধী শক্তির সাথে প্রকাশ্য লড়াই করেই তা সৃষ্টি করতে হবে। তবে আমাদের সংঘটিত বিপ্লব পূর্ণাংগ

www.nagorikpathagar.org

হবেনা। একে পূর্ণতা দান করবেন ইমাম মেহদী। এই "পূর্ণতা" শব্দটি অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ এথেকে মনে করেছে, নাউযু বিল্লাহ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন ইসলামকে অপূর্ণ রেখে গেছেন এবং ইমাম মেহদী এসে তাকে পূর্ণতা দান করবেন। খোমিনীর বক্তব্যের অর্থ এটা মোটেই নয়। তাঁর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে কামেল ও মুকাম্মাল দ্বীন দিয়ে গেছেন। তাঁর সময় এদ্বীন শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তৎকালীন অর্ধদুনিয়ায় তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু মেহদী এসে তাকে সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবেন ইসলামী বিপ্লব। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ইসলামেব ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। তিনি দ্বীনের পূর্ণতার নয় বরং বিপ্লবের পূর্ণতার ও বিপ্লবের ব্যাপ্তির কথা বলেছেন। এই অর্থে তিনি ইরান বিপ্লবকে সারা দুনিয়ায় এক্সপোর্ট করার সংকল্প রাখেন।

ইমাম খোমিনী বেলায়েতে ফকীহর ক্ষেত্রে আসল কর্তৃত্ব ফকীহর হাতে সোপর্দ করেছেন। ফকীহ হচ্ছেন সমগ্র জাতির 'ওলী,' অভিভাবক, কর্তা, নেতা ও সরদার। তিনি ইরানে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন তাতে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র ও বিভাগের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ফকীহর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। গ্রামের কাউন্সিল গুলো থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মজলিস (পার্লামেন্ট) এবং দেশের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রের নেতৃত্ব ফকীহর হাতে এসে গেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, কলকারখানা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই এবং সব ধরণের কমিটি, কাউন্সিল ও মজলিসের পরিচালনা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হচ্ছেন ফকীহ। ফকীহর নেতৃত্বের ব্যাপারে কারোর আপত্তি নেই। কিন্তু খোমিনী যেভাবে ফকীহকে প্রশাসনিক যন্ত্রের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং তাকে সর্বত্র নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন তাতে দেশে বহুতর জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং আরো বহু সমস্যা সৃষ্টির প্রবলতর সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর বেলায়েতে ফকীহর চিন্তা ফকীহ মহলেও একচেটিয়া সমর্থন পায়নি। বিভিন্ন স্থানের ফকীহরা এর সাথে তীব্র মত বিরোধ পোষণ করেন। এমনি তো সমস্ত আয়াতুল্লাহ নিজেদের ইল্মী মরতবার কারণে বিপুল জনপ্রিয়তা ও সম্মানের অধিকারী। কিন্তু জন সমর্থনের আধিক্যই তাঁদের মর্যাদার তারতম্য নির্ণয় করে। ইরানে বর্তমানে এমনি বিপুল জনপ্রিয় সাত জন বিশিষ্ট আয়াতুল্লাহ রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১) আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমিনী, ২) আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ কাযেম শরীয়ত মাদারী, ৩) আয়াতুল্লাহ শাহাবুদ্দীন আল মার'আশী, ৪) আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আবদুল্লাহ শিরাযী, ৫) আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বেয়া গুলপায়ে-

www.nagorikpathagar.org

গানী, ৬) আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মাদ শিরাযী এবং ৭) আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ সাদেক রুহানী।

আয়াতুল্লাহ মুনতাযিরীও বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী। কিন্তু ধর্মীয় নেতার পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতা ও খোমিনীর সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে তার খ্যাতি বেশী। বর্তমানে তিনি কুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ইমাম খোমিনীর স্থলাভিসিক্ত হিসেবে তাঁর নাম জনগণের মুখে মুখে শুনা যায়। দ্বীনী নেতৃত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন আকায়ে শরীয়ত মাদারী। কিন্তু ইমাম খোমিনীর সাথে কোনো কোনো মতবিরোধের কারণে তিনি যবনিকার অন্তরালে চলে গেছেন। ইমাম খোমিনী বেলায়েতে ফকীহ্‌র যে ধারণা পোষণ করেছেন উপরে উল্লেখিত সাত জন সর্বাধিক জনপ্রিয় আয়াতুল্লাহর মধ্যে অধিকাংশই কোনো না কোনো পর্যায়ে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে আসল ও প্রকাশ্য মতবিরোধ করেছেন আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারী। শরীয়ত মাদারী ইমাম খোমিনীর দেশান্তরের সময় দেশে আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি শাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে ইরানী জনগণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ৭৮ সালের জানুয়ারীতে কুমে ও ফেব্রুয়ারীতে তাবরীযে বিরাট বিক্ষোভ ও সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষের ফলে হাজার হাজার ব্যক্তি নিহত ও গ্রেফতার হওয়ার প্রতিবাদে শরীয়ত মাদারী ৯ই মে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেন। অতঃপর ২৮শে মে আয়াতুল্লাহ খোমিনী ও আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারী একযোগে শাহের কাছে বুনিয়াদী শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়ন ও ইসলামী আইন প্রবর্তনের দাবী জানান। তিনি ইমাম খোমেনীর প্যারিস থেকে বিমান যোগে আগমন কালে জনগণের অস্বাভাবিক জোশ, আবেগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে একটি বিখ্যাত বাক্য উচ্চারণ করেছিলেনঃ ইমাম মেহদী প্যারিস থেকে বিমান যোগে এসে অবতরণ করবেন না।

বিপ্লবের পর শরীয়ত মাদারীর সাথে মতবিরোধ বেড়েই চলতে থাকে। তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য ইমাম খোমিনীকে যথারীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। পরে মিলমিশ হয়ে যায়। কিন্তু নীতিগত বিরোধের সিলসিলা এখনো জারী রয়েছে। ইমাম খোমিনী নিজের শাসতন্ত্রের খসড়া তাঁর কাছেও পাঠান এবং তাঁর মতামত চান। তিনি নিজের দ্বিমত সম্বলিত মন্তব্য সহ ঐ খসড়া ফেরত পাঠান। কিন্তু ঐ খসড়াকে চূড়ান্ত রূপদান করার পর আর তাঁর কাছে পাঠানো হয়নি। আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারীর সাথে যারা সাক্ষাত করেছেন তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, ফকীহদেরকে সরাসরি প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ এবং তাদেরকে দেশের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান নিযুক্ত করার তিনি বিরোধী। তাঁর আপত্তিও ভবিষ্যতের আশংকাগুলো নিম্নরূপঃ

১) দীর্ঘকাল থেকে ফকীহদের তৎপরতা কেবল ইল্‌মী কার্যকলাপ ও জ্ঞানগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

www.nagorikpathagar.org

পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ট্রেনিং তাদের নেই। এই অনভিজ্ঞতার ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা প্রকার গলদ দেখা দেবে। এর ফলে আলেমদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং এটা যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।

২) সরকারের উপায় উপকরণ যতই ব্যাপক হোক না কেন নাগরিকদের প্রয়োজন ও আশা আকাংখা শতকরা একশো ভাগ পূরণ হওয়া কখনো সম্ভব নয়। এখন যদি প্রশাসনিক নেতৃত্বদানের দায়িত্ব আলেমদের ওপর সোপর্দ করা হয় তাহলে জনগণের কোনো প্রতিক্রিয়া অভিযোগের রূপ নিলে আলেম গণ তার আসল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবেন। এর ফলে আলেমদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও নেতৃত্বদানের সম্পর্ক আহত হবে এবং ইরানী সমাজে বর্তমানে আলেমদের প্রতি যে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তা খতম হয়ে যাবে। নেতৃত্বদানের মর্যাদা থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে বঞ্চিত হয়ে যেতে থাকবেন। আর জনগণের এহেন প্রতিক্রিয়ার ফলে দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্কও দুর্বল হয়ে যেতে থাকবে।

৩) উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশটি দ্বীনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অধিকারী, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুশীলন লাভ করেছে এবং ইসলামী বিপ্লবের জন্য আলেমদের নেতৃত্বে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারা হতাশ হয়ে ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ও পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা আবার পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যেতে থাকবে এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মীতার সম্পর্ক বজায় থাকবেনা।

৪) উলামাগণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে একে ইসলামী বিপ্লবের ব্যর্থতা হিসেবে চিত্রিত করা হবে। এর ফল হবে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী।

তাঁর দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, এই আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা তাদের সমগ্র আন্তরিকতা এবং জ্ঞানগত ও শৈল্পিক দক্ষতা সত্বেও যেমন আমাদের দ্বীনী মাদ্রাসাগুলো পরিচালনা করতে পারেনা তেমনি আমরাও বর্তমানে জটিল রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখিনা। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষাও অনুশীলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সে সময় পর্যন্ত আমরা অবশ্যি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিতে পারি কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্বের বোঝা আমাদের নিজেদের মাথায় চাপিয়ে না নেয়া উচিত।

শরীয়ত মাদারীর প্রস্তাব ছিল, আমরা বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান গড়ে দিতে এবং তাদেরকে শরীয়াতের সীমানার মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলার সুবিধে করে দিতে পারি। সরকারকে জ্ঞানগত পথ নির্দেশনা দিতে পারি। এজন্য আমারা ফকীহর মর্যাদার অধিষ্ঠিত থাকবো। জনগণের সাথে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-মর্যাদার সম্পর্ক বজায় থাকলে কোনো সরকার আমাদের পরামর্শকে

www.nagorikpathagar.org

অবজ্ঞা করতে এবং আমাদের বিরোধিতার আশংকাকে গুরুত্বহীন মনে করতে পারেনা। বর্তমানে সরকার ও জনগণের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে জনগণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আমরা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। কিন্তু এ বিরোধ সরাসরি আমাদের ও জনগণের মধ্যে শুরু হলে জনগণ কাদের দিকে তাকাবে? তারা তখন কাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে? তাদের জন্য কে আওয়াজ বুলন্দ করবে? এ অবস্থায় জনগণ যদি কোন পথ নির্দেশ ও নেতৃত্ব না পায় তাহলে এর পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে?

আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারীর এ দৃষ্টিভংগীর সাথে অধিকাংশ আলেম একমত। কিন্তু ইমাম খোমিনী এ আপত্তি ও আশংকাগুলোকে কোনো গুরুত্বই দেননা। তিনি ফকীহদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার আসন থেকে বিচ্যুত করতে প্রস্তুত নন। তিনি আইন প্রণয়ন ও আইন প্রবর্তন দুটোকে দুটো আলাদা আলাদা হাতে তুলে দিতে চাননা। ইসলামের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি ধর্মীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য এবং অবশিষ্ট জন শ্রেণীর তাদের প্রতি আনুগত্য অপরিহার্য গণ্য করেন।

বিপ্লবের শক্তির আসল উৎস

ইরান বিপ্লবের শক্তির আসল উৎস হচ্ছে যুব-ছাত্র সমাজ। কুমের মাদ্রাসার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ডঃ আলী শরীয়তীর মতো জ্ঞানীও চিন্তাবিদদের থেকে তারা চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভ করে। আর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরবরাহ করেন ইমাম খোমিনী। এ রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বীনী দূরদৃষ্টিসহ দৃঢ় সংকল্প, অবিচলতা, ত্যাগ ও কুরবানীর গুণাবলীতে অভিসিক্ত। শুধু ইরানের ভেতরে নয়, আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে লাখো লাখো ছাত্র শাহ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রগামী ছিল। বিপ্লবকে তার শেষ মনযিলে পৌঁছাবার জন্য তারা নিজেদের প্রাণের নজরানা পেশ করেছে সবচেয়ে বেশী। আজো তারাই ইরানের বৃহত্তম শক্তি। তারা এই বিপ্লবের প্রহরী, সংরক্ষক, পাসদার (প্রতিরক্ষী), তত্ত্বাবধায়ক ও সংগঠক। তারা এর সবকিছু। বেহেশতী যোহরায় গেলে তাদের কুরবানী আন্দাজ করা যায়। সেখানে দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত শহীদদের কবর। আর কবরের গায়ে টাঙানো যুবকদের ছবি। এই কবরের সংখ্যা এখন ৬০ হাজার পৌঁছে গেছে। তাদের মধ্যে নওজোয়ান শহীদদের সংখ্যা হবে ৫০ হাজার। ইরানের জনসংখ্যারও শতকরা ৫০ ভাগ হচ্ছে যুবক।

বিপ্লবের পর জীবনের সবক্ষেত্রে নওজোয়ানদেরকেই খোমিনী অগ্রবর্তী করেছেন বেশী। বেশী বয়স্ক ও প্রৌঢ়দেরকে, যারা অত্যধিক গতানুগতিক ও গড্ডালিকা প্রবাহে চলতে অভ্যস্ত, তাদেরকে তিনি পরিচলনা ও প্রশাসন

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যুব রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছেন। তারা জোশ, আবেগ ও বিপুল উদ্দীপনার সাথে বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে। দেশের একমাত্র আইন প্রণয়ন পরিষদ—যেখানে ফকীহদের প্রাধান্য—সেখানে ছাড়া বাদবাকি সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই আসল নিয়ন্ত্রণ যুবকদের হাতে। মার্কিন জিম্মীদের বিরুদ্ধে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে এই যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। আজ তেহরান বা দেশের যে কোনো অফিস বা প্রতিষ্ঠানে চলে যান দেখবেন ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের যুবকরা সব জায়গায় ছেয়ে আছে। পাসদারানের সমগ্র সংগঠনই—যার আকার বর্তমানে সেনাবাহিনীর কয়েকগুণ বড় হয়ে গেছে—এই যুবকদের নিয়েই। বিপ্লবের প্রাণধারাকে গতিশীল ও সঞ্জীবিত রাখার জন্য পাবলিসিটির সমগ্র বিভাগ ও সমস্ত অভিযানই এই যুব সমাজের সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। খবরের কাগজ ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের প্রাধান্য। দেশের যে কোনো সিদ্ধান্তকারী শক্তি ও পরোক্ষ শাসক হচ্ছে তারাই। তারাই সব ব্যাপারে হুকুম করে এবং বয়োবৃদ্ধরা মাথা নত করে তা মেনে চলে। তবে এই বয়োবৃদ্ধরা যদি উলামা হন তাহলে তাদের সামনে আবার এই যুব সমাজ মাথা নত করে। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, এই উলামাও ফকীহদের অবশ্যি ইমাম খোমিনীর সমর্থক হতে হবে। যুবকদের মধ্যে আবার যারা দ্বীনী ইলমের অধিকারী তারাই সবচেয়ে অগ্রগামী। তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

সারা দেশের ব্যবস্থাপনা, তার গঠন ও উন্নয়নমূলক তৎপরতা, বৈদেশিক দূতাবাস পরিচালনার দায়িত্ব, বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লব থেকে রক্ষা করার উপায়, মুজাহিদীনে খাল্‌কের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা ও তার প্রতিশেধকের ব্যবস্থা করা এবং এই সংগে শ্লোগান, গান, পুস্তিকা, ব্যাজ, কার্টুন ও অন্যান্য উপায় উপকরণের মাধ্যমে বিপ্লবের বর্তমান পরিবেশকে তার বর্তমান অবস্থায় ও মানে স্থিতিশীল রাখার জন্য সমগ্র যুব-সমাজের শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার একটা ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, বিগত আড়াই বছর থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে রয়েছে। যুবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বর্তমানে গ্রাম এলাকায় গঠনমূলক তৎপরতাসমূহ সংগঠনকারী সংস্থা 'জিহাদী জীবন'-এর পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে নিয়োজিত। অথবা তারা শহরের অফিস আদালত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পথ-ঘাট ও গলি-কুচার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। পাসদারানের কর্মী হিসেবে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে অথবা হাতে রাইফেল উঠিয়ে বিভিন্ন স্থানে তাদের টহল দিতে দেখা যায়। ইরাকের সাথে যুদ্ধেও তারা অংশ নিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কলেজের মধ্যে কেবলমাত্র মেডিকেল কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও টেকনিক্যাল কলেজ খোলা আছে। চিকিৎসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত এবং টেকনিক্যাল আমলা সরবরাহের ক্ষেত্রে যাতে অচলাবস্থা সৃষ্টি না হয় সে জন্য এগুলো খোলা রাখা হয়েছে। অন্যান্য সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের জানানো হয়েছে যে, তাদের পূর্ণাংগ সিলেবাস তৈরী করে সেখানকার শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ রাখা হবে। টেকনিক্যাল ও প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান গুলোর ক্ষেত্রে এটা কোনো জটিল সমস্যা ছিলনা। এসব প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস আদর্শিক শিক্ষার প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার মধ্যে খোদাদ্রোহীতা, নাস্তিক্যবাদ ও আরো বহু বিভ্রান্তিকর মতবাদের গভীর প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছিল। একটি জাতীয় সিলেবাস কমিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাস প্রণয়ন ও পুরাতন সিলেবাস পুণর্বিবেচনার কাজ করে যাচ্ছে। তারা নিজেদের কাজ শেষ করার সাথে সাথেই এ সিলেবাস বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবর্তন করা হবে এবং সেগুলো খোলা হবে। বর্তমানে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। প্রতি তিন মাস পর তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়। তাদেরকে ঘরে বসিয়ে অথবা অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করে পুরো বেতন দেয়া হচ্ছে। বিপ্লবী সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমরা আর নাস্তিক, কাফের ও মুনাফিক তৈরী হতে দেবোনা। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো যদি এজন্য দশ বছরও বন্ধ রাখতে হয় তাও আমরা রাখবো।

আপাতদৃষ্টিতে এটা সিলেবাস পরিবর্তন ও শিক্ষা সংশোধনের একটা ব্যাপার বলে মনে হয় এবং এর গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কিন্তু পর্দান্তরালে আরো কিছু সত্য দৃষ্টিগোচর হয়। আসল জটিলতা ও বাস্তব সমস্যা হচ্ছে, বর্তমানে সমগ্র ইরানও তার ইসলামী বিপ্লবের সমস্ত ভার যুবকদের কাঁধে ন্যাস্ত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে গেলে তাদেরকে যদি সেখানে পাঠানো হয় তাহলে বিপ্লবী সরকারকে তার বর্তমান প্রকৃতি ও চরিত্র সহকারে কে সামলাবে? ২৪ ঘন্টা বিপ্লবকে কায়েম রাখার জন্য চৌকস থাকা, উদ্দীপনাময় শ্লোগানে চতুর দিক মুখরিত রাখা, পথ-ঘাট ও গলি কুচা শ্লোগান, পোষ্টার ও ব্যানারে ভাসিয়ে দেয়া, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনাকারীদের পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা, পাসদারান সংগঠন পরিচালনা করা এবং জিহাদী ধরনের জীবন যাপনের তৎপরতা জারী রাখার জন্য লোক কোথায় পাওয়া যাবে? যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজ পথ থেকে সরিয়ে নেয়া হলে এ শূন্য স্থান পূরণ করবে কে?

বিপ্লবী সরকারের আর একটা সমস্যাও দেখা দেবে। যে যুবকদের

www.nagorikpathagar.org

হাতে গত তিন বছর থেকে ষ্টেনগান, রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্র শোভা পাচ্ছে এবং যাদের মধ্যে বিপ্লবের জোশ এখনো উন্মত্ততার পর্যায়ে রয়ে গেছে তাদেরকে তারা শিক্ষায়তনে ফিরে যেতে এবং অস্ত্রের পরিবর্তে বই হাতে তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে কেমন করে? বিপ্লবের দাবী হচ্ছে তাদের জোশ ও আবেগে যেন ভাটা না পড়ে আবার অন্য দিকে শিক্ষার দাবী হচ্ছে জোশ ও আবেগ যেন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে থিতিয়ে আসে যার ফলে তাদের মনে শিক্ষার আগ্রহ জন্মাবে এবং শিক্ষার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করবে তারা। যুবকদের কাছ থেকে অস্ত্র ফিরিয়ে নেয়াও একটা কঠিন সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে। এর সুরাহা কিভাবে হবে? এ সম্পর্কে এখনো কিছু বলার সময় আসেনি। তবে সমস্যার ভয়াবহতা অনুমান করা যায়।

দেশের আভ্যন্তরীন শত্রুদের মোকাবিলা করা, তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, ইরান-ইরাক যুদ্ধে বিজয় লাভ করা এবং বিপ্লবী সরকারের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করার জন্য খোমিনীর এখনো এই সশস্ত্র আবেগ উচ্ছল যুবকদের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে নিজে নিরস্ত্র অবস্থায় আসল শক্তিকে হাতছাড়া করার অনুমতি দেবার পরিনামের মোকাবিলা করতে পারবেন না। বর্তমানে তিনি শিক্ষার চাইতে নিজের বিপ্লবের প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দেবেন। কাজেই তাঁর নিজের ইচ্ছা মতো বিপ্লবের পূর্ণতা সাধনের পর্যায় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো খোলার সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখা যাচ্ছে। এ যুবকরা এখনো দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের সংঘটিত বিপ্লবের হাতে বন্দী হয়ে থাকবে। ভেতরের ও বাইরের বিপদ তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি এর হাত থেকে মুক্ত হবার অনুমতি দেবে না।

শিক্ষা বিভাগে বিপ্লবী সরকারের আসল কৃতিত্ব হচ্ছে, তারা সহশিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছেন। শিক্ষায়তনগুলোকে ইসলামী আদব-কায়দা ও নীতি-নৈতিকতার রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছেন। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলগুলোর সিলেবাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও বিপ্লবের প্রাণ সত্তার সাথে একাত্ম করে দিয়েছেন। কুমের নিকটবর্তী হাসনাবাদ নামক গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল- মাদ্রাসা জওয়াদ বাহনার দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। 'জিহাদী জীবন'-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে এ স্কুল গৃহটিকে বড় করে একটি সুদৃশ্য বিলডিংয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় সংগীত ও শ্লোগান এখানকার প্রত্যেকটি ছাত্রের কণ্ঠস্থ। দ্বীনের মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে সবাই ওয়াকিফহাল। তাদের আলোচনা, কথাবার্তা, ওঠা-বসা

www.nagorikpathagar.org

লেবাস–পোশাক ও আচার-ব্যবহারের ওপর ইসলামের নৈতিক শিক্ষার গভীর প্রভাব বিরাজমান। ঐ শিশুগুলোকে দেখে মনে হলো ইরানে বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতি ও চরিত্রের অধিকারী নাগরিক তৈরী হচ্ছে, যারা দৃঢ়সংকল্প ও বলিষ্ঠ হিম্মতের অধিকারী, শাহাদত লাভের জন্য আকুল এবং ইসলামের জন্য পাগলপ্রায়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারমূলক পরিকল্পনায় শিক্ষকদেরকেও উন্নত জীবনের সুযোগ সুবিধা দান করা হয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতন হচ্ছে তিনশো ইরানী রিয়াল। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন এক হাজার ইরানী রিয়াল। রাষ্ট্র প্রধানের বেতনও এটিই। অথাৎ সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বেতনের হার ৩ঃ১ এদিকটি অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায় নীতির অনুসারী। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকরা এতদিন পর নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি

ইরান বিপ্লব রাজতন্ত্রের কবর রচনা করেছে। এই রাজতন্ত্র দেশে যে মার্কিনী শোষণ ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তারও উচ্ছেদ সাধন করেছে। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এর মাধ্যমে দেশ ও জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আমাদের দেশে সভ্যতাকে সাধারণত একটি সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। কিন্তু আসলে তার সম্পর্ক রাজনৈতিক জীবনের সাথে অত্যন্ত গভীর। এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে মুসলিম দুনিয়ার যে কোন রাজধানী শহরের উচ্চ মধ্য ও নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট হবে। এভাবে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সমান পর্যায়ের জ্ঞানও একই পর্যায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা সম্পন্ন লোক যদি দুটি সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করে তাহলে তাদের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে সুস্পষ্ট তারতম্য পাওয়া যাবে। ধর্মের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভংগী বিভিন্ন হবে। নিজেদের দেশবাসীদের সাথে তাদের ব্যবহার ও সমান হবেনা। সাংস্কৃতিক ইউনিটগুলি নিছক লেবাস-পোশাক, উঠা-বসা ও আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে আলাদা হয়না বরং নিজেদের চিন্তাধারা, মতবাদ, মানসিক দৃষ্টিকোন ও রাজনৈতিক চরিত্রের দিক দিয়েও পৃথক ও সুসংবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার ধারক হয়। এভাবে তারা প্রত্যেকেই এক একটি পূর্ণাংগ একক হিসেবেই গড়ে ওঠে।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিবাদিতাও ভোগবাদী জীবন দর্শনের উপাদানে গঠিত। এ সভ্যতার বাইরের

www.nagorikpathagar.org

নিদর্শনগুলোকে তাদের প্রাণসত্তা থেকে আলাদা করে গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। একবার প্যান্ট, কোট ও নেকটাই পরে নিজের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। বাহ্যত এদুটো নিছক পোশাক ও দেহাবরণ মনে হয়। কিন্তু শরীরের ওপর যা চাপানো হয় তা মন ও মস্তিষ্কের ভেতর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলে। আমাদের আবেগ অনুভূতিতে দীনতা, কোমলতা, গর্ব, হীন মন্যতাবোধ, আনন্দ, প্রশান্তি, শ্বাসবদ্ধতা, নিশ্চিন্ততা, অস্থিরতা ও জটিলতা প্রভৃতি সূক্ষ্মতমবোধের বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে। যে চেয়ারটায় আমরা বসি তার গঠনাকৃতি ও সৌন্দর্য আমাদের মানসিক ও দৈহিক স্নায়ুগুলিকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নেয়। এই একই মাপকাঠিতে গৃহ, যানবাহন, আসবাবপত্র, জীবন যাপনের সাজ-সরঞ্জাম, শিক্ষার উপায়-উপকরণ ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের প্রভাবকে বিচার করা যেতে পারে। এটা নিছক অর্থনৈতিক উচ্চ ও নিম্নবিত্তের কোনো সাদামাটা ব্যাপার নয়। প্রত্যেকটি বস্তু তার মূল্য ছাড়াও নিজের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একটা স্বতন্ত্র প্রভাব রাখে। পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য কখনো কোকাকোলা আর কখনো জম-জমের পানি পান করুন। দুটোই পানীয়। কিন্তু স্থান ও সভ্যতার গঠন সম্পর্কের কারণে কোকাকোলার বোতলটা হাতে আসতেই মন চলে যায় আমেরিকান সমাজ ব্যবস্থার দিকে আর অন্যদিকে জমজমের পানি দেখতেই দৃষ্টিতে ভেসে উঠে কাবাঘরের তওয়াফের দৃশ্য।

প্রাসংগিক আলোচনা দীর্ঘায়িত হলো। যাহোক আমাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল ইরানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলোপ। একে আধুনিক পরিভাষায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবও বলা যায়। সেই প্রসংগে আবার আসছি। ইরান বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকীতে কাইহান ইন্টার ন্যাশনালে প্রদত্ত এক বিশেষ সাক্ষাতকারে "আপনার মতে বিপ্লবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কি" প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট খামেনী বলেনঃ বিপ্লবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি। বিষয়টাকে তিনি আরো সুস্পষ্ট করে বলেনঃ আমরা একটি বাঁধাধরা, পরনির্ভর, উপনিবেশ-বাদী ও সুস্পষ্ট নকল নবীশ ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়েছি। আমরা নিজেদের আসল ইসলামী সভ্যতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এমন পর্যায়ে প্রবেশ করেছি যেখান থেকে আমাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিল্প-ক্ষেত্রের যাবতীয় উন্নতি অগ্রগতি আমাদের নিজেদের নীতি ও মানদণ্ড অনুযায়ী সাধিত হবে।

বিপ্লবের পূর্বে ইরান বিশেষ করে তার রাজধানী তেহরান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। মদ, জুয়ার আড্ডা,

www.nagorikpathagar.org

অসংখ্য পতিতালয় এবং পাশ্চাত্যের যাবতীয় অশালীন ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল সেদেশে। বড় বড় সুদৃশ্য বিলডিং-গুলো ছিল ধনীদের বিলাসিতার আড্ডা। ইউরোপ থেকে প্রসাধনী ও বিলাসব্যাসন সামগ্রী আমদানী করে দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হতো। নারী-পুরুষের মিশ্রক্লাব ও মহফিলের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাজারে, পথে-ঘাটে নামমাত্র পোশাক পরিহিতা ও পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা প্রসাধনী ও বিলাস ব্যাসনে সজ্জিতা সুন্দরীদেরকে দলে দলে দেখা যেতো। তেহরানের মাথায় চেপে বসেছিল লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও হলিউড হবার ভূত। একদিকে ছিল এভাবে বিজাতীয় সভ্যতার আক্রমণ এবং অনাদিকে ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনী উঁচু নীচ বিরাট বিরাট প্রাসাদের আকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়া-ছিল। এগুলোর সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা দৃষ্টিকে মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়াভি-ভূত করে ফেলতো।

জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির এমনি একটি প্রাসাদ দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রাসাদটি একটি উঁচু পাহাড়ের ঢালের ওপর এক ফার্লং পর্যন্ত বিস্তৃত। সিঁড়ির মতো তা একের পর এক আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ওপরের স্তরে ২৪টি কামরা বিশিষ্ট মহলটি সবচেয়ে উঁচু। তার সামনে রয়েছে সাঁতার কাটার জন্য একটি বিরাট পুকুর। সেখানে সূর্যস্নানের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। তার নীচে লন। এর সাথে রাজ্যের সুন্দর সুন্দর গাছ ও লতাগুল্মের সমন্বয়ে গড়ে তোলা সুদৃশ্য বাগিচা। তার নীচে অর্ধবৃত্তাকারে ছড়ানো বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে গম্বুজ আকারে নির্মিত একটি কাঁচের ঘরে নানা জাতীয় চারাগাছ রাখা হয়েছে। এরপর থেকে আবার শুরু হচ্ছে আরো কিছু সুদৃশ্য বাগ-বাগিচা। এই লনটির বৈশিষ্ট হচ্ছে যতদূর দৃষ্টি যাবে সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখা যাবে। চোখের দৃষ্টি ও সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে কোথাও কোনো অন্তরাল সৃষ্টি হবেনা। বর্তমানে এ প্রাসাদটির মধ্যে অদ্ভূত নির্জনতা বিরাজ করছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বুঝি কোনো প্রেতপুরী। এ প্রাসাদের অধিবাসীরা বর্তমানে সবাই পলাতক। মাত্র জনৈকা বৃদ্ধা এখানে বসে এখন তার জীবনের শেষ দিনগুলি গুণছে। প্রাসাদটির মালিকের ব্যাপারে জানলাম তিনি একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসায়ী। এর চাইতেও বড় বড় আলীশান প্রাসাদ নাকি কয়েক ডজনের মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। রাজপ্রাসাদ ও রাজবংশের লোকদের প্রাসাদগুলো তো এর চাইতে আরো বেশী জাঁক-জমকপূর্ণ। বর্তমানে এগুলোর অধিকাংশই মিসরের পিরামিডের মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেখতে আলীশান কিন্তু আসলে গোরস্তান।

www.nagorikpathagar.org

এই বিরাট বিরাট প্রাসাদে যারা বাস করতো তারা ইরানের সাধারণ মানুষদের থেকে আলাদা আরেক জগতের জীব বলে মনে হতো। বাইরের কোনো খবরই তারা রাখতোনা। ফ্রান্সের রাণী মেরীর সাথেই তাদের তুলনা করা যেতে পারে। ভাত ও বিরিয়ানীর পার্থক্য তারা জানতো না। গ্রাম ও ছোট শহরের গরীব বাসিন্দারা ঐ প্রাসাদগুলো ও তার মধ্যে বসবাসকারী জীবদের ঠাট বাটের মধ্যে নিজেদের অভাব ও বঞ্চনার কুৎসিত চেহারা দেখে শিউরে উঠতো। বিলাসিতার উদ্দাম তরংগের সাথে সংঘর্ষমুখর হয়ে তাদের আহত অনুভূতিগুলো ক্রোধে ফুঁসতে থাকতো। কিন্তু ফেরাউনের গর্বিত সেনাদলের মতো সমুদ্রের মধ্যিখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই আয়েশী জীবদের বোধোদয় হলোনা।

বাদশাহ তাঁর চার পাশের বিত্তশালী শ্রেণীকে নিয়ে আসলে জনগণ থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র জীবন যাপন করছিলেন। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কোলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়েছিল। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতের মুঠোয় ছিল এবং শতকরা ৯৫ জন অধিবাসীর এতে কোনো অধিকারই ছিলনা। বিপ্লব এসে তার তরংগাঘাতে স্বচ্ছল ও প্রাচুর্যের দ্বীপের আশে পাশের পর্বত প্রমাণ প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দিলো। পাশ্চাত্য সভ্যতার জাল কেটে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হলো। মদের পিপাগুলো পচা ড্রেনে ঢেলে দেয়া হলো। জুয়ার আড্ডা ও পতিতালয়গুলোর দরজায় তালা ঝুলানো হলো। অর্ধোলংগ মেয়েদেরকে যথার্থ অর্থে 'পর্দানশীনা' বানানো হল। প্রসাধন ও বিলাস দ্রব্য আমদানী বন্ধ করে দেয়া হলো। পর্দার বিরুদ্ধে সেখানকার উলংগ বাহার মহিলারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ করলো। কিন্তু তাদেরকে সোজা করে দেয়া হলো এবং অচিরে তারাও চাদর ও বোরকায় শরীর ঢাকা শুরু করলো। যৌন উচ্ছৃংখলতা ও চারিত্রিক নৈরাজ্যের যাবতীয় প্রবনতা ও পথ রুদ্ধ করে দেয়া হলো। শক্তি প্রয়োগ অবশ্যি ভালো নয় কিন্তু সভ্যতা, সংস্কৃতিও নৈতিকতার সীমার ব্যাপারে এর ব্যবহার মোটেই খারাপ মনে হয়না। কাপড় পরানো ও কাপড় খুলে ফেলে দেয়ার ব্যাপারে যদি সমানভাবে শক্তি ব্যবহার করা হয় তাহলে অন্য অবস্থায় তার নৈতিক বৈধতা রয়েছে। খোমিনী যদি আইন করে মেয়েদের শরীর ঢাকতে বাধ্য করেন এবং সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ ও তুরস্কের জেনারেল কেনান যদি তাদের চেহারা থেকে নেকাব এবং মাথা থেকে ওড়না ছিঁড়ে ফেলে বেপর্দা করতে উঠে পড়ে লাগেন তাহলে একজন মুসলমান এক্ষেত্রে কোন্‌টা সমর্থন করবে? এক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করাকে হযরত উমর (রাঃ) ও তো বৈধ গণ্য করেছিলেন। মেয়েদের ওপর কেবল পরদারই নয়, ঘর থেকে বের হয়ে ইচ্ছেমতো বাইরে

www.nagorikpathagar.org

ঘুরে বেড়াবার ওপর তিনি বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন এবং হাতে দোর্‌রা নিয়ে এ বিধিনিষেধ কার্যকর করেছিলেন।

আজকের ইরান একটি বিরাট নৈতিক বিপ্লবের চিত্র পেশ করছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র পরিবেশে হাজার হাজার মেয়েকে চাদরে সমস্ত শরীর ঢাকা অবস্থায় পথে ও বাজারে দেখা যাচ্ছে। তাদের আশে পাশে হাজার হাজার যুবকও ঘুরাফিরা করছে। কিন্তু নৈতিকতা বিরোধী কোনো একটি ঘটনাও সেখানে ঘটছেনা। একজন তার চারদিকে লজ্জার একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর একজনকে তার এই প্রাচীরের রক্ষক বলে মনে হচ্ছে। চাদর ও চারদেওয়ালের হেফাজত কিভাবে হতে পারে তা ইরানে এসে বুঝলাম। এই সংগে আল্লামা ইকবালের কবিতার এ লাইনটার মর্ম ও অন্তর্নিহিত সত্যও উপলব্ধি করলাম ঃ

"নিস্‌ওয়ানিয়াতে যান কা নিগাহ্‌বাঁ হ্যায় ফাকাত মর্দ"

অর্থাৎ–'একমাত্র পুরুষই হচ্ছে নারীর নারীত্বের হেফাজতকারী।'

ইবলিস নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে এভাবে বিফলে যেতে দেখে এখন মাথার চুল ছিঁড়ছে ও চিৎকার করে বলছে ঃ

"আল হাযর আইনে পয়গম্বর সে সও বার আল হাযর/হাফেযে নামুসে যান, মর্দ আযমা, মর্দ আফ রীঁ।"

অর্থাৎ—'বাঁচাও ! বাঁচাও ! পয়গম্বরের আইন থেকে বাঁচাও ! এ আইন হচ্ছে নারীর নারীত্বের সংরক্ষক, পৌরুষ পরীক্ষিত আর পুরুষের গৌরব।'

কেবলমাত্র এক শ্রেণীর বিদ্রোহী মহিলাদেরকে জোর করে পর্দার মধ্যে আনা হয়েছে। অন্যথায় মহিলা সমাজের বৃহত্তম অংশ সুসভ্য ও রুচিশীল জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই পর্দার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তারা জানতে পেরেছে পর্দা তাদের দুশমন নয়। দুশমনের লালসা দৃষ্টি ও অনিষ্ট-কারিতা থেকে পর্দা তাদেরকে রক্ষা করছে বলে তারা অনুভব করতে পেরেছে। তাদের ইজ্জত, আবরু ও নারীত্বের সংরক্ষণ একমাত্র পর্দার মধ্যেই সম্ভব। কেবলমাত্র তেহরান ও বড় বড় শহরগুলোর সীমিত সংখ্যক মহিলাদের জন্যই পর্দার সমস্যা ছিল। নয়তো ইরানে অধিকাংশ মেয়েরাই আগে থেকেই পর্দার অনুসারী। পাশ্চাত্য সামাজিকতায় অভ্যস্ত মেয়েদেরকে এপথে আনার জন্য শিক্ষা ও অনুশীলনের উপায় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম খোমিনীর কোনো কোনো বাণী মেয়েদের পর্দার মধ্যে অবস্থান করার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে। যেমন তাঁর একটি বাণী ঃ

"বোনেরা ও মেয়েরা ! তোমাদের পর্দা শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্র।"

তাঁর আর একটি বাণী হচ্ছে ঃ

www.nagorikpathagar.org

"শত্রুরা আমাদের শহীদের রক্তকে তত ভয় করেনা যত ভয়
করে আমাদের বোন ও মেয়েদের পর্দাকে।

আর একটি শ্লোগান শুনুন ঃ

"পর্দা আমাদের বোন ও মেয়েদের জিহাদ।"

পর্দার পর অন্য যে জিনিসটা প্রথম পর্যায়েই সমাজের চেহারা পরিবর্তনের ইংগিত দেয় সেটা হচ্ছে সমাজের একক চেহারা। অর্থনৈতিক ইনসাফ ও সাম্যের বিস্তারিত বর্ণনা পরে করবো, এখানে কেবল সামাজিক দিকটা তুলে ধরতে চাই। আগে বিভিন্ন শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পরিসর ছিল পৃথক। এখন এসব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে। এখন সমাজের একটি মাত্র চেহারা। নতুন ও বর্ধিষ্ণু সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর ইসলামের রঙ অত্যন্ত প্রবল। ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। যে উঁচুতে ছিল তাকে একটু নীচেয় নামিয়ে দিয়ে এবং যে নীচেয় ছিল তাকে একটু উঁচুতে তুলে দিয়ে দু'জনকে কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। এই নৈকট্যের মধ্যে রয়েছে হাজার বছরের দূরত্ব। মানসিক দূরত্বের প্রকাশও দেখা যায়। কিন্তু বিপ্লব তার কাজ করে যাচ্ছে। গরীবের হীনমন্যতাবোধ খতম হয়ে যাচ্ছে। বরং অনেকাংশে খতম হয়ে গেছে। আর আমীরের ধনাঢ্যতার নেশাও টুটে যাচ্ছে। ইমাম খোমিনী নিজের বিপ্লবকে 'মুস্তাদ'আফীন দর' (দুর্বল, অনুন্নত ও নিষ্পেষিত সর্বহারা শ্রেণী) বিপ্লব এবং 'মুতাকব্বিরীনদের' (উচ্চ ধনীও অর্থমদমত্ত শ্রেণী) শক্তি ধ্বংস করার জন্য এসেছে বলে দাবী করেন। বিপ্লবের শক্তির বলে তাদের শক্তি যথেষ্ট ধ্বংস হয়েছে। মুতাকাব্বিরীনদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। এখন তারা জীবনের নতুন সত্যের সাথে সমঝোতা করতে এগিয়ে আসছে। পুরানো সামাজিক কাঠামো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। সেখানে নতুন কাঠামোর উদ্ভব হচ্ছে। আর এ কাঠামো ইসলামী সভ্যতার প্রতীক। এর গঠন প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাপ্রবনতা ও জবরদস্তির হারের পরিমাণ জানা সহজ নয়। কিন্তু বিপ্লব তো জবরদস্তি ও বল প্রয়োগেরই অন্য নাম। স্বেচ্ছাকৃতভাবে যদি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতো তাহলে আর শক্তি প্রয়োগ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে বিপ্লব সাধনের প্রয়োজন হবে কেন ?

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আর একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখা যাবে সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে। কবিতা, চিত্রাংকন, সংগীত, রেখাচিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইরান বিশ্ব জোড়া খ্যাতির অধিকারী। মূর্তি গড়া ইসলামে নিষিদ্ধ বলে প্রাণীর মূর্তিগড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা ও বিপ্লবের প্রাণসত্তা অনুযায়ী হাজার হাজার নতুন কবিতা লিখিত হয়েছে—যাকে নতুন সৃষ্টি বলা যেতে পারে। সংগীতে

www.nagorikpathagar.org

অস্বাভাবিক শক্তি অর্জন করেছে। রেখাচিত্র যেন নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়েছে। শুরু হয়েছে তার নতুন যুগ। কুরআনী আয়াতগুলো এমন চমৎকার ও নতুন ভাবে তথতির ওপর লেখা হয়েছে যে তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাদের দেশে আর্ট ও সাহিত্যকে ব্যবহার করা হয় চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এবং ইসলামকে সাহিত্য ও শিল্পকলার শত্রু বলা হয়। কিন্তু ইরানে সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রমাণ করার যে নতুন ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে তাতে ইসলামই সাহিত্য ও শিল্পকে নব জীবন দান করেছে। সৃষ্ট যোগ্যতার মধ্যে আজ সৃষ্টি সুখের নতুন উল্লাস দেখা যাচ্ছে। তিন বছর থেকে বরং বিপ্লবের আগের দুবছরকে সাথে নিলে গত পাঁচ বছর থেকে সাহিত্য ও শিল্প তৎপরতার এক্ষেত্রটি কেবল তার ব্যাপকতা বাড়িয়েই চলেছে এবং নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

শিক্ষা বিভাগে সব চাইতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হচ্ছে : সমস্ত শ্রেণী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো খতম করে দেয়া হয়েছে। সমস্ত শিক্ষায়তনগুলোকে একই সিলেবাসের আওতায় আনা হয়েছে। এটা এমন একটা সুদূর প্রসারী পরিবর্তন যার মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র নক্‌শাটাই বদলে যাবে। বর্তমানে কোনো শিশুকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য নিজের ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদার কথা চিন্তা করা হয় না বরং নিজের আবাসস্থলের সব চাইতে কাছের স্কুলটি নির্বাচন করা হয়। সে সব স্কুলের পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মারাও অপরাধ ছিল এখন সেখানে ধনী ও গরীবের ছেলে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করছে। তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে একই জাতির সদস্য হবার অনুভূতি।

কৃষক শ্রমিকদের জীবনে বিপ্লব

ইরান বিপ্লব যেহেতু মুতাকাব্বিরীনদেরকে (ধনিক শ্রেণী) নামিয়ে মুস্তাদআফীনদেরকে (দরিদ্র ও সর্বহারা শ্রেণী) ওপরে উঠাবার জন্যই সাধিত হয়েছে, তাই একদিকে যেখানে বড় বড় শহরে ধনীদের মহল, বিশেষ জাঁকালো বাজার ও প্রমোদ উদ্যানগুলো বিরান হয়ে গেছে সেখানে অন্যদিকে গরীব, মজুর ও গ্রামের কৃষককুলের মধ্যে অস্বাভাবিক জোশ ও উদ্দীপনা এবং পল্লীগুলোয় অবর্ণনীয় প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। বিপ্লবের ফলে শহরের ঔজ্জ্বল্য কমে গেছে কিন্তু গ্রামগুলোয় নতুন চমক সৃষ্টি হয়েছে। শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের চেহারার মধ্যেও এ পার্থক্য দেখা যায়। শহরে ভীতি, আশংকা, গাম্ভীর্য, অজানা বিপদ ও আতংকের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু গ্রাম বিভিন্ন উন্নয়ন ও গঠনমূলক তৎপরতার আনন্দে ও কৃতজ্ঞতার সংগীতে পরিপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার সাথে সাথেই ইমাম খোমিনী তেহরান ও অন্যান্য শহরের বিরাট বিরাট প্রাসাদ, গগণচুম্বী ইমারত ও বিলাসিতার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ ফ্লাটগুলোর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। নির্মাণ তৎপরতাকে তিনি গ্রামের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শহরে শুধুমাত্র মজদুর ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের বস্তিগুলোর নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ জারী রয়েছে। বরং এ কাজকে দ্রুততর করা হয়েছে। শহরে নির্মাণাধীন বড় বড় ইমারতগুলো যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই সেগুলোর কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। ক্রেনগুলো মাঝ পথেই আটকে রয়েছে।

গ্রাম এলাকায় নির্মাণ কাজের জন্য "জিহাদ সাযি যিন্দেগী" (জিহাদী জীবন) নামে একটি আলাদা সংগঠন কায়েম করা হয়েছে। ইমাম খোমিনীর নির্দেশে বিপ্লবের ৪ মাস পরে ১৯৭৯ সালে ১৮ জুন এ সংগঠনটি কায়েম করা হয়। গত বছরের জুন পর্যন্ত দু'বছরে এ সংগঠনটি যে কাজ করেছে সরকারী পরিসংখ্যান মোতাবিক তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসেব নীচে দেয়া হলো :

গ্রামে ১৪৬৯টি গোসলখানা, ৮৭টি চিকিৎসা কেন্দ্র, ৪৮৪টি মসজিদ, ১২২টি পানির ঝরণা, ৫১২১টি অযু খানা, ১৯৩৪টি পাকা বাড়ী, ২৪৯৯ কিলোমিটার জলপথ, ১৯৯৭ টি স্কুল, ৪২২৪টি পুল, ১৫৩১২ কিলোমিটার পাকা পথ, ২১৮৯টি বাঁধ, ৩০৫২টি কূয়া, ৪৭১৭টি ট্যাংক ও ১১৮২টি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। ৬১৭৭৯ হেক্টর (১ হেক্টর= ১০ হাজার বর্গ মিটার) জমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ২১৩৪টি গ্রামে পাইপ লাইনের সাহায্যে পরিস্কার পানীয় পানি সরবরাহ করা হয়েছে, ৪০৫৭টি কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়েছে ও ৫০৯১টি নতুন মেশিন সেখানে পৌঁছানো হয়েছে। ১০৫৫টি গ্রামে বিজলী সরবরাহ করা হয়েছে ও ৪৯৯১৯টি আস্তাবল পরিস্কার ও মেরামত করা হয়েছে। ১৭৮৪৯০৭৯টি গবাদি পশুকে টীকা লাগানো হয়েছে। ২৫৬৬৩২ টন সার ও ৯৮৯১৮৩ টন কীটনাশক ঔষধ, ৫৫৯৫৪ টন বীজ ও ১২৯৬৭৪ টন চারা সরবরাহ করা হয়েছে। ডাক্তারদের ৮৩৪৮টি দলকে গ্রামে পাঠানো হয়েছে এবং ১৫০৬৭০২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। জনগণের দ্বীনী তালীম ও তরবিয়ত এবং সাধারণ সমাজ জীবন গঠন ও উন্নয়নের জন্য ৫৬১৫টি ইসলামী কাউন্সিল গঠন এবং ১২৬৩৫টি পাঠাগার কায়েম করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানের সাথে পরবর্তী আরো প্রায় এক বছরের কাজ যুক্ত করলে এর পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

'জিহাদী জীবন' সংগঠনের অধীনে কয়েক জায়গায় গ্রাম উন্নয়নের কাজ দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এ সংগঠনটির সমস্ত কর্মীই হচ্ছে যুবক।

www.nagorikpathagar.org

তারা কোথাও পারিশ্রমিক নিয়ে আবার কোথাও বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে এ কাজ করে যাচ্ছে। তারা প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১২ ঘণ্টা খাটে। কূয়া ও খাল কাটা, স্কুল, পুল, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ এবং পানি বিজলী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা ছাড়াও তারা গৃহ নির্মাণ কাজও চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কুমের নিকটবর্তী মুবারকআবাদ, হাসান আবাদ ও হাজী আবাদে তাদের তৈরী তিন কামরার ঘর দেখেছি। এগুলো ২শো বর্গগজের প্লটে নির্মাণ করা হয়েছে। মোজাইক করা মেঝে এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্রসহ যে সব কৃষক পরিবারকে এগুলো দেয়া হয়েছে তাদের আনন্দ দেখার মতো। এখানে আমরা যেসব যুবককে কাজ করতে দেখেছি তাদের কাজের গতি, আগ্রহ, নিষ্ঠা ও জোশ দেখে আমাদের মনে হয়েছে, এরা নিছক ভাড়াটে কর্মী নয় বরং আসল বিপ্লবী প্রাণসত্তায় ভরপুর গঠনমূলক শক্তি। গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজের ফলে শস্য উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে। গম চাষের জমি ৫৬৬০০০ হেক্টর বেড়ে গেছে। প্রত্যেক গ্রামে ৭ জনের একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। তারা কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের কাজ করে। এ পর্যন্ত ৮৫ হাজার হেক্টর জমি বণ্টন করা হয়েছে।

কৃষি সংস্কার কমিটির প্রধান হচ্ছেন আয়াতুল্লাহ মাশকিনী। এ কমিটির সদস্য তিনজন। কুমে মাশকিনী সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তিনি ইমাম খোমিনীর বিশ্বস্ত আলেমদের অন্তরভুক্ত। তিন বা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'মজলিসে কায়েদীন' (নেতৃমজলিস) গঠনের ব্যাপারে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে। ইমাম খোমিনীর পর এই নেতৃ মজলিসই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে। তার প্রাণরক্ষার অস্বাভাবিক শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা দেখে আমরা তাঁর গুরুত্ব অনুভব করলাম। আয়াতুল্লাহ মাশকিনী আমাদেরকে জানালেন, পলাতক লোকদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর অন্যান্য জমি মালিকদের হাতে ৫ হেক্টরের বেশী জমি রাখা হয়নি। অতিরিক্ত জমি-গুলো সরকার ন্যায্য মূল্যে কিনে নিয়েছে। এ গুলোভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। জমির ব্যাপারে তিনি সরকারের এ দৃষ্টিভংগীও সুস্পষ্ট-ভাবে পেশ করেন যে, সমস্ত জমি আল্লাহর মালিকানাধীন। এ দৃষ্টিতে তা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। কারণ রাষ্ট্রের মালিকানাই হচ্ছে আল্লাহর মালিকানার প্রকাশ। রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছামতো বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হবার অনুমতি দিতে পারেনা। কারণ বিপুল পরিমাণ জমির মালিকানা 'মুতা-ক্বাব্বিরীন' শ্রেণীর জন্ম দেয় এবং জুলুমের উদ্ভব ঘটায়। তাই তারা একদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর ফলে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়ে গেছে। অন্যদিকে তারা সর্বাধিক পরিমাণ জমি চাষাবাদের অন্তরভুক্ত করার অভিযান শুরু করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লবী সরকার গ্রামের কৃষকদের সাথে সাথে শিল্প ও কারখানা শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের প্রতিও বিশেষ নজর দিয়েছে। এ প্রসংগে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, শ্রমিকদের সমস্ত ইউনিয়ন ও ফেডারেশন বাতিল করে দেয়া হয়েছে। কারণ এগুলোর বেশীর ভাগ ছিল কমিউনিষ্টদের দখলে। এ ইউনিয়নগুলোর পরিবর্তে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুটি করে সংগঠন কায়েম করা হয়েছে। একটি মজলিসে শুরা এবং দ্বিতীয়টি ইসলামী আঞ্জুমন। শুরু হচ্ছে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী আঞ্জুমন আদর্শিক শিক্ষা ও অনুশীলন প্রদানকারী সংস্থা। এ দুটি মৌলিক সংগঠন কায়েম না করা পর্যন্ত কোনো কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলা বা চলানোর অনুমতি দেয়া হয়নি।

শিল্প সংস্থাগুলোর কেন্দ্রীয় শুরা সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগলোর নিয়ন্ত্রন করে। প্রত্যেক ইউনিটের শুরায় সরকার থেকে তিনজন সদস্য দেয়া হয়েছে। এ তিনজন সদস্য হচ্ছেঃ জেনারেল ম্যানেজার, ফিনান্স ডাইরেক্টর ও প্রশাসন ডাইরেক্টর। অবশিষ্ট সদস্যদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্য থেকে নেয়া হয়। অফিসারের সংখ্যা তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অবশিষ্ট সবাই বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকারী সম মর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন হচ্ছে তিনশো রিয়াল। প্রতিদিনের কাজের শেষে তাদেরকে বেতন দেয়া হয়। স্থায়ী কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন হচ্ছে চারশো রিয়াল। আর জেনারেল ম্যানেজারের বেতন ১২শো রিয়াল। অর্থাৎ বেতনের হার ৩ঃ১। কোনো কোনো শ্রমিক নিজের কারিগরী দক্ষতা ও উচ্চতর যোগ্যতার কারণে জেনারেল ম্যানেজারের চাইতেও বেশী বেতন পায়। ১৯৮২ সালের ২১ মার্চ থেকে মুনাফা বন্টনের নতুন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী মুনাফার তিনটি সমান অংশ করা হবে। একটি অংশ সরকার পাবে, একটি অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধানে ব্যয় করা হবে আর তৃতীয় অংশটি শ্রমিকদেরকে বোনাস হিসেবে দেয়া হবে। এভাবে সমগ্র মুনাফার শতকরা ৩৩ ভাগ মজুররা পাবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান মজুরদেরকে পোশাক, চিকিৎসার সুবিধা, যানবাহন ও কাজের মধ্যে একবেলার খাবার সরবরাহ করে। এখাদ্য সবার জন্য সমান। নিজে নাও নিজে খাও-এর ভিত্তিতে এখাদ্য সরবরাহ করা হয়। সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি শ্রমিকদের জন্য গৃহ বা প্লট বরাদ্দ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর ফলে ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাহুল্য হবেনা এবং শ্রমিকদের যাতায়াতে সময়ের অপচয় থেকেও বাঁচা যাবে। কাজ থেকে বরখাস্তের সময় প্রত্যেক শ্রমিককে তার পাওনাসহ এক হাজার রিয়াল দেয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আঞ্জুমান শ্রমিকদেরকে লেখাপড়া শেখায় এবং তাদেরকে ধর্মীয় ও আদর্শিক শিক্ষাও দান করে। এ উদ্দেশ্যে কর্ম সময়ের মধ্যে এক ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যেক কারখানায় লাইব্রেরী ও মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। অসংখ্য উলামা ইসলামী আঞ্জুমানের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তাঁরা কারখানায় যান এবং শ্রমিকদের মধ্যে বক্তৃতা করেন।

শ্রমিকদের এক দিনের বেতন প্রতিরক্ষা তহবিলে যায়। তাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রেও পাঠানো হয়। বিপ্লবী সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব বড় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১) সমস্ত ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ব করে মিল্লি ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গুলোকে বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাউন্সিলের আওতাভুক্ত করে প্রত্যেক ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২) অর্থনীতির তিনটি বৃত্ত কায়েম করা হয়েছে ঃ সরকারী, ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সাহায্য। সমস্ত বৃহত শিল্প, বৈদেশিক বানিজ্য, খনি, বীমা কোম্পানী সমূহ, ব্যাংক সমূহ সরকারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

৩) সুদ, ঘুষ, তহবিল তসরুফ, জুয়া, সরকারী ঠিকেদারীর মধ্যে অবৈধ কারসাজি, পতিতাবৃত্তি এবং অন্যান্য নাজায়েয পন্থায় সংগৃহীত অর্থ-সম্পত্তি সরকারের কর্তৃত্বাধীনে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ গুলোর ব্যাপারে আরো তদন্ত চলছে।

৪) সরকারী হিসাব নিকাশের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য একটি অর্থনৈতিক আদালত কায়েম করা হয়েছে। মজলিসের আওতাধীনে এ আদালত কাজ করবে।

৫) বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের ওপর কোনো মুনাফা নেয়া হবে না।

৬) সুদ খতম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি।

কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে মার্কিন যিম্মি সমস্যা ও ইরান ইরাক যুদ্ধ তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আজকের ইরান কোনো সমৃদ্ধিশালী দেশের নাম নয়। কিন্তু এ দেশটি তার জীবনের সমগ্র নকশাটি পরিবর্তন করার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সংগঠন, প্রতিষ্ঠান কায়েম ও ইসলামী নীতি প্রবর্তনের যে নমুনা আমাদের সামনে পেশ করেছে, তা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে গভীর পর্যবেক্ষণ ও আন্তরিক অধ্যয়নের দাবীদার। ভবিষ্যতের আশংকা তো অনেক এবং তা থাকবেই কিন্তু ইরানী জাতি

www.nagorikpathagar.org

ইমাম খোমিনীর নেতৃত্বে যে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে তা অবহেলার যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যাশী এবং এ পথের সমস্যা ও সংকটগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল তাকে অবশ্যি ইরান বিপ্লবের দিকে বার বার ফিরে তাকাতে হবে। কারণ, এটা হচ্ছে আমাদের সমকালীন বিপ্লব। এর প্রতি সমর্থন ও বিরোধিতার প্রসংগ বাদ দিয়ে বলছি—এর সাফল্য ও ভুলগুলির যথার্থ বিশ্লেষণ আজকের প্রতিটি মজলুম, অনুন্নত ও পরানুগৃহীত জাতির নিজস্ব প্রয়োজন।

যুব বিপ্লবীদের হতাশ কণ্ঠস্বর

ইরান বিপ্লব জীবনের সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের ছাপ রেখেছে, এ অর্থে একটা সর্বাত্মক বিপ্লব। পুরাতন ব্যবস্থার কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসেনি বরং এ বিপ্লবটি জীবন ক্ষেত্রের সমগ্র চিত্রটিই বদলে দিয়েছে। একটা নতুন চিন্তাধারার কাঠামোয় সমাজ গঠিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি ভূমির ওপর এর পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের গঠনমূলক কাজের শুরুতেই থাকে ভাঙনের পর্যায়। ইরানে এখন পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙার কাজ চলছে জোরে শোরে। আর এরি সাথে চলছে পুনর্গঠনের কাজও। ভাঙা-গড়ার এ তৎপরতা যেহেতু সমগ্র ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পুরোপুরি ঘিরে নিয়েছে এবং এই সংগে আভ্যন্তরীণ সমস্যার সাথে সাথে বাইরের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাও সেখানে চলছে তাই তার সমস্যাগুলো হয়ে পড়েছে অত্যন্ত জটিল এবং এর প্রভাব ও ফলাফল হয়েছে তরংগের মতো স্ফীত। আশা ও নিরাশার তরংগ এখানে পরস্পর মিশে গেছে। কখনো মনে হয় স্থিতিশীলতার ব্যাপকতা নেহাত কম নয় আবার কখনো বিপদের অনুভূতি এমন ভাবে তরংগায়িত হয় যার ফলে গভীর আশংকায় হৃদয় দুলে ওঠে।

ইতিপূর্বের আলোচনায় চিত্রের একটি দিক সুস্পষ্ট হয়েছে। এবার অন্য দিকটাও দেখা যাক। বিরোধীদের আপত্তি ও পর্যালোচনার আলোকে এবার ইরান বিপ্লবের মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ এক তরফা আলোচনা ও পর্যালোচনা কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছোতে পারেনা। চিত্রের অপর দিকটি দেখার পরই আমরা এ ব্যাপারে কোনো সঠিক রায় দিতে পারবো। শেষ পর্যালোচনায় বিরোধীদের মতামত যুক্তির মাধ্যমে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে কিন্তু প্রথম থেকে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে গন্যই না করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিরোধী পক্ষকে আমরা তিনটি দলে বিভক্ত করবো। এক, বাইরের বিরোধীরা। এর মধ্যে পাশ্চাত্য বিশ্বের নাম রয়েছে তালিকার শীর্ষে। দুই, ভেতরের এমন সব বিরোধীরা যারা ক্ষমতাও কর্তৃত্ব হারা হয়েছে। তিন, ভেতরের

www.nagorikpathagar.org

এমন সব বিরোধীরা যারা নিজেরা বিপ্লব অনুষ্ঠানে পূর্ণ শক্তি ও আবেগ নিয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল। এক সময় তারা ছিল ইমাম খোমিনীর ডান হাত বিপ্লব সফল হবার পর ইমাম খোমিনীর আস্থার ভিত্তিতে তারা প্রশাসনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। বিপ্লবী সরকারের পলিসি গঠন ও ত বাস্তবায়ন ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারপর কোনো মতবিরোধের কারণে সরকারী পদে বহাল থাকতে পারেনি। এদের মধ্যে অনেকে যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে। মত বিরোধ সত্বেও এদের অস্তিত্ব বরদাশত করে নেয়া হয়েছে এবং মতবিরোধ সত্বেও এরা সহযোগিতার সিল-সিলা জারী রেখেছে। এরা আসলে বিরোধী নয় বরং নীতিগত মতবিরোধকারী এদের মধ্যে রয়েছেন বিপ্লবী সরকারের প্রথম প্রধান মন্ত্রী মেহদী রাজারগান, প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইবরাহীম ইয়াযদী, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাদেক কুতুব জাদাহ এবং আরো কয়েকজন। বাজারগান ও ইবরাহীম ইয়াযদী আজো পার্লামেন্টের সদস্য রয়েছেন এবং আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করছেন। আরো কিছু বিরোধী রয়েছেন। তারা সরকারী দায়িত্ব থেকে আলাদা হবার পর দেশে টিকতে পারেননি। ইরান থেকে পালিয়ে তারা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে প্রতি বিপ্লবের জন্য কাজ করছেন। যেমন ঃ রাজাবী, বনীসদর প্রভৃতি। আবার এমন অনেকে আছেন যারা কোনো পক্ষে যোগ না দিয়ে চুপ চাপ সময় অতিবাহিত করছেন। এদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর জনাব আলী রেজা নওবারী। তিনি ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বিতীয় গভর্ণর হন এবং ১৯৮১ সালের জুন পর্যন্ত নিজের দায়িত্বে বহাল থাকেন। তিনি ছিলেন বনিসদরের অত্যন্ত নিকটতম বন্ধু।

আমরা পাশ্চাত্য দুনিয়ার মতামত ও তার সমস্ত প্রপাগাণ্ডাকে আমাদের ইরানী ভাইদের মতই এক কথায় নাচক করে দিচ্ছি। শাহের খান্দানের লোক-জনদের এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বহারা বিরোধী পক্ষের মতামতকেও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করছিনা। বনিসদর ও রাজাবীর মতো যারা এখন প্রতিবিপ্লবের জন্য কাজ করছেন তাদের কথাকেও আমল দিতে চাইনা। যারা বর্তমান সরকারের সাথে কাজ করছেন এবং নিজেদের মতবিরোধকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আনতে চাননা তাদের বক্তব্যের প্রতিও কোনো গুরুত্ব আরোপ করতে চাইনা এবং অনর্থক তিলকে তাল বানানোর কোনো উদ্দেশ্যই আমাদের নেই। কিন্তু যারা নিজেরাই বিপ্লবের সাথী ছিলেন এবং বর্তমানে তার সম্পর্কে মাপাজোকা ও ভারসাম্যপূর্ণ পর্যালোচনা পেশ করছেন তাদের মতামতকে আমরা কেমন করে প্রত্যাখ্যান করি ? এ ধরনের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন আলী রেজান ও বারী। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাময়িকী ইউরোমনী (EUROMONEY)

www.nagorikpathagar.org

এর ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ সাক্ষাতকারে তিনি নিজের সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছেন। উক্ত পত্রিকার প্রতিবেদক ইলিন ম্যাকলোড কোনো এক গোপন স্থানে তাঁর সাথে চারটি বৈঠকে এ সাক্ষাতকার নেন।

আলী রেজা নওবারী বনীসদরের মতো আমেরিকান দূতাবাসের কর্মচারী-দেরকে দীর্ঘকাল যিম্মী করে রাখার বিরোধী ছিলেন। সরকারের এ পলিসির সাথে একমত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশের অর্থনীতির এই চরম সংকটকালে উন্নত কার্যক্রমের পরিচয় দেন এবং সারা দুনিয়া থেকে নিজের যোগ্যতার স্বীকৃতি আদায় করেন। আমেরিকা তার সমস্ত ব্যাংকে ইরানের জমা দেয়া সমুদয় অর্থ আটকে ফেলে। এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তার মোকাবিলা করেন এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোকে আমেরিকার পথ অনুসরণ থেকে বাঁধা দেবার ব্যাপারে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে আমেরিকার কাছ থেকে সেখানে আটকে পড়া সম্পদ আদায় করে স্থানান্তরিত করা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে ইরান সরকারের শর্তাবলী নিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আলো-চনা ও চুক্তি সম্পাদিত হয় সবগুলিই নওবারীর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও যোগ্যতার ফসল।

শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন শুরু হলো তখন নওবারী আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেনফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথমেটিক্সে ডক্টরেট লাভের জন্য পড়াশুনা করছিলেন। তিনি মুসলিম ছাত্রদের বিখ্যাত সংগঠন এম, এস, এ, এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন কট্টর ধর্মপ্রাণ। ইরানী ছাত্রদের জুমার নামায তিনিই পড়াতেন। খোমিনীর ভীষণ ভক্ত ছিলেন। বিপ্লব তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, লেখাপড়া প্রায় বন্ধ করে দিয়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিপ্লব সম্পর্কিত প্রচার পত্র ও পুস্তিকা বিলি করতেন। ইমামের বক্তৃতার ক্যাসেট শুনিয়ে ফিরতেন। বক্তৃতা দিতেন। ইরানী ছাত্রদেরকে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাতেন। সাধারণ মুসল-মান ছাত্রদেরকে এই বিপ্লবের সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি প্যারিসে ইমাম খোমিনীর সাথে কয়েক বার সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তেহরান পৌঁছেন। প্রথমে বনীসদর প্রতিষ্ঠিত রেভ্যুলুশান প্রত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯৭৯ এর নভেম্বরে খোমিনী তাঁকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন।

তাঁর জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল নোটের পরিবর্তন। ইমামের হুকুম ছিল শাহের ছবিওয়ালা নোট এখনই বাতিল করে দাও। তিনি নতুন নোট তৈরী করলেন। তাতে সিংহের ছবি অপরিবর্তিত রইলো। এবার ইমাম হুকুম

www.nagorikpathagar.org

দিলেন সিংহের ছবিও হটাও। কারণ ওটাও শাহের আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নওবারী জানালেন, এটাতো ইরানের জাতীয় প্রতীক। শাহের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ইমামের হুকুম অমান্য করার সাধ্য তাঁর ছিলনা। কাজেই এক মাস ধরে ২৫টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান দিনরাত নোটের ওপর থেকে সিংহের ছবি ঢেকে ফেলার কাজ করতে থাকে।

নওবারীর জন্য দ্বিতীয় বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রধানমন্ত্রী রেজাইর সাথে বিরোধ। প্রধান মন্ত্রী অর্নৈতিক বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিত্য নতুন হুকুমনামা জারী করতেন। নওবারী বাধা দিলে জবাব আসতো, "তুমি বাঁধা দেবার কে? তোমার কাজ শুধু আমার হুকুম মেনে চলা।"

নওবারী জোর দিয়ে বলতেন, নির্দেশগুলো কোনো আইন ও নীতিমালার মাধ্যমেই আসা উচিত। কিন্তু রেজাই তাঁর কোনো কথা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ইমামের কাছে নওবারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। বনীসদর ও রেজাইর মধ্যে যে মারাত্মক আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলছিল তাতে বনীসদরের বন্ধু হিসেবে নওবারীও অভিযুক্ত হলেন। বনীসদরকে ১৯৮১ সালের ১০ জুন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ থেকে হাটিয়ে দেয়া হয়। এর দু'দিন আগে নওবারীকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্ণরপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। সে সময় পর্যন্ত তিনি ইসলামিক রেভ্যুলুশান পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর সে দিন তেহরান পেঁছার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এই বরখাস্তের অর্থ বুঝতেন। তাই তিনি সংগে সংগেই টেলেক্সের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে স্ত্রীকে দেশের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করেন। নওবারীও গোপনে বহু কষ্ট স্বীকার করে কুর্দিদের এলাকা হয়ে দেশের বাইরে পালিয়ে যান। নওবারীর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি লুকিয়ে পড়ার সাথে সাথেই তাঁর মায়ের গৃহে ৯ জন সশস্ত্র ব্যক্তি আক্রমণ চালায়। তারা রাইফেলের নলের মুখে তাঁর মাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে কিন্তু আসলে তাঁর মা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কাজেই ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত তারা তাঁকে কষ্ট দেবার পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। নওবারী বর্তমানে কোথায় আছেন তা বলতে রাজী নন। কারণ সশস্ত্র ব্যক্তিরা সব সময় তাকে খোঁজে ফিরছে। তিনি গোপন স্থানে যে সাক্ষাতকার দেন তার আলোকে বর্তমান ইরানের চিত্রের অপর দিকটা একবার দেখা যাক।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার পটভূমি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন: আমেরিকান দূতাবাসের কর্মচারীদেরকে জিম্মী বানানো আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি ধ্বংসকর সিদ্ধান্ত ছিল। আমার জানা মতে শাহের প্রিয় ব্যাংক চেজ ম্যানহাটন ইরানী সম্পদ ফ্রীজ করার পরিকল্পনা আগেই

www.nagorikpathagar.org

তৈরী করে ফেলেছিল এবং মার্কিন সরকারের ওপরও এ উদ্দেশ্যে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু এজন্য সে একটা বাহানা তালাশ করে ফিরছিল। জিম্মী সংকট তাদের হাতে সে বাহানা তুলে দিল। ইরান সরকার জিম্মীদেরকে ব্যবহার করলো আভ্যন্তরীন রাজনীতির স্বার্থে। রিপাবলিকান পার্টিকে মজবুত করা,খোমিনীর শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়া এবং অবস্থাকে তাঁর ইচ্ছামতো পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করাই ছিল এর লক্ষ্য। বাইরের শত্রুদের ভয় দেখিয়ে তিনি নিজের অবস্থান শক্তিশালী করে নিয়েছেন। ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন কর্মচারী-দেরকে জিম্মী বানানো হয়। এর দশদিন আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর মুহাম্মাদ আলী ইস্তেফা দিয়েছিলেন। ১৪ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার ইরানী সম্পদ আটকের নির্দেশ জারী করেন। ১৫ নভেম্বর বনী সদর আমাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণরের দায়িত্ব নিতে বলেন। বনীসদর তখনো প্রেসিডেন্ট হননি। আমার সামনে উপস্থিত সমস্যা ছিল দুটো। ইরানী সম্পদ যত বেশী পারা যায় আমেরিকার হাত থেকে বের করে নেয়া আর আয়ের পথ সংরক্ষিত রাখা। বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও যদি আমেরিকার পথ অনুসরণ করতো তাহলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইরান খতম হয়ে যেতো। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এমনটি হয়নি। মুসাদ্দিকের আমলে এমনটি হয়েছিল। ফলে শাহ আবার ফিরে এসেছিলেন।

'৭৯ সালের নভেম্বরে আমাদের কাছে সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। ১৯৮০ সালের শীতকালে এ অর্থ ১৫০ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছে যায়। এটিই ছিল এর সর্বোচ্চ সীমা। এর কারণ ছিল তেলের বাজারের অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থা। নওবারী আমেরিকার সাথে পাঞ্জা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইরানী শর্তাবলীর পটভূমি বর্ণনা করে বলেন, আমেরিকায় সউদী আরবের ১০ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার রয়েছে। তাই আমি ইসলামী সম্মেলনে ইরানী অর্থ ফ্রীজ করার মার্কিন সিদ্ধান্তের নিন্দা করতে সফল হই। আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হলো, তুমি এই প্রস্তাবে সউদী আরব ও অন্যান্য আরব দেশগুলোর স্বাক্ষর নিতে পারবেনা। কিন্তু আমি তাদের স্বাক্ষর নিয়েছি। কারণ তারা আশংকা করছিল একবার এটা সফল হয়ে গেলে তারপর তাদের পালাও আসতে পারে। নওবারীর মতে জিম্মী সংকটের মাধ্যমে ইরান লাভবান হয়েছে কম আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক বেশী। তাদেরকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করে দিলে ইরান অনেক বেশী লাভবান হতো। জিম্মীদের মুক্তির পর বনীসদর খোমিনীর কাছে পত্র লেখেন : 'আপনি পূর্বে যে চারটি শর্ত আরোপ করেছিলেন তার একটি ও পূরণ হয়নি। শাসনতন্ত্রের যে ১০টি ধারাকে আপনি সবচেয়ে পবিত্র গণ্য করেন এবং তার বিরুদ্ধাচরণকারীকে দুনিয়ার সব চাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে

www.nagorikpathagar.org

থাকেন তার সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। এ ধারাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য অসংখ্য লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমেরিকা প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত ভালো শর্ত পেশ করেছিল। কিন্তু পরে যেসব শর্তের ভিত্তিতে সমঝোতা হয় তার ফলে আমাদের অর্থনীতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

নওবারীর মতে খোমিনীর কাছে লিখিত এ পত্রটিই বনীসদরের পতনের মূল কারণ। জিম্মীদের মুক্তির পর আমিও সরাসরি খোমিনীকে বলেছিলাম, "যা কিছু হয়েছে এজন্য আপনিই দায়ী।" তাঁর সাথে এভাবে কথা বলার সাহস কারোর ছিলনা। কিন্তু তিনি এর জবাবে বলেন, "না, আমি এজন্য দায়ী নই, এজন্য দায়ী হচ্ছে সরকার।" জবাবে আমি বলেছিলাম, "সরকার তো আপনারই।" এরপর আলোচনায় তিক্ততা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ইমাম খোমিনীর সম্ভাব্য স্থলাভিষিক্ত আয়াতুল্লাহ মুনতাযিরী আলোচনায় বাধা দিয়ে বলেন, "চুক্তি হয়ে যাবার পর যিম্মীদের ব্যাপারে বলা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" তখন আমিও বনীসদর একবাক্যে বলেছিলাম, "জিম্মী-দেরকে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এখানে রাখাটাই ছিল বিশ্বাসঘাতকতা।" বাহজাদ নববী টেলিভিশনে এসে বলেন, "লোকদেরকে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরোধে লিপ্ত করানো।" আমি ও বনীসদর এর জবাবে বলেছিলাম, "তুমি যাকে তুচ্ছ ব্যাপার বলছো তাতে ইরানের কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে।

নওবারী বলেন, চুক্তির পর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, আমাদের মুদ্রার কোনো আইনগত মর্যাদা নেই। এর পশ্চাতে অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রার ষ্টক এবং ৭৫ ভাগ আমাদের দেশীয় উপকরণ থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে আমরা হীরা ও অন্যান্য অলংকারাদিও ব্যবহার করেছি। এগুলোকে প্রথমে বলা হতো 'শাহী অলংকারাদি'। এগুলোর নাম পরিবর্তন করে আমি নামকরণ করি 'জাতীয় অলংকারাদি'। এখন এগুলোরও কোনো খবর নেই। (উল্লেখ্য, এ সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসে। এরপর গত ৬ মার্চ লণ্ডনে একটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, ইরান সরকার অলংকারাদি বিক্রির জন্য একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফার্মের সাথে যোগাযোগ কায়েম করেছে। নওবারী এ সাক্ষাতকারে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, ফেব্রুয়ারীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমস্ত সংরক্ষিত ষ্টক খতম হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অলংকারাদি বিক্রির খবর বহুলাংশে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে।)

নওবারী বলেনঃ শাহের বিদায়ের সময় সর্বমোট ৯৬ হাজার কোটি রিয়ালের নোট মজুদ ছিল। আমি দায়িত্বভার গ্রহণের সময় ১১৫ হাজার

www.nagorikpathagar.org

কোটি রিয়ালের নোট বাজারে চালু ছিল। ১৯৮১ সালের মার্চ পর্যন্ত ঐ নোট ১৩৬ হাজার কোটি রিয়ালে পেঁাছে এবং এখন ১৫০ হাজার কোটি রিয়ালে পেঁাছেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান মোতাবিক মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধির হার শতকরা ৫০ ভাগ। ২০ লাখ সরকারী কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান গত ৩ বছরে শতকরা ৬৬ ভাগ নিম্নগামী হয়েছে। এরা হচ্ছে বিপ্লবী জনতার এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাদের অনবরত ধর্মঘটের কারণে শাহের ক্ষমতার আসন টলে গিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লব তাদেরকে দুই তৃতীয়াংশ আয় থেকে বঞ্চিত করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২০ থেকে ৩০ লাখ। এখন তাদের সংখ্যা এ নিয়ে পেঁাছেছে ৪০ লাখে। এর বড় কারণ হচ্ছে, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তেহরানের পথে এখন লোকদের দেখা যায় সিগারেটের ডিবা বা অন্য কোনো ছোটখাটো জিনিস হাতে নিয়ে ট্যাক্সির পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে। আরো নতুন নোট ছাপার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

নওবারী অভিযোগ করেছেন, উলামা শ্রেণী বর্তমানে ব্যবসাও নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। তারা ইসলামী ব্যাংক নামে নিজেদের আলাদা ব্যাংক কায়েম করার চেষ্টা করেন। ২০ জন বড় ব্যক্তির মধ্যে আয়াতুল্লাহ বেহেশ্‌তী ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আয়াতুল্লাহ বেলীও ছিলেন। তারা ৮ কোটি ডলার সংগ্রহ করেন। পরে সমস্ত ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংকের চার্টারও অনুমোদিত হয়েছিল। আমি তাদের পৃথক ব্যাংক কায়েম করার অনুমতি দেইনি। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা শাসনতন্ত্রের আওতার বাইরে। পরে তারা "ইসলামী অর্থনীতির ইরানী সংগঠন" নাম দিয়ে নিজেদের ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায়িক পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে এ কারবারটি বিপুল মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। শাহের আমলে শাহী খান্দানের কোনো ব্যক্তি বোর্ড অব ডাইরেকটরসে না থাকলে কোনো বড় কারবার করা সম্ভব ছিলনা। বর্তমানে এ কাজটি অন্যভাবে হচ্ছে। আমদানী লাইসেন্স প্রিয় পাত্রদেরকে রাজনৈতিক ভিত্তিতে জারী করা হয়। ইসফাহানে জনৈক ব্যবসায়ীকে সারা বছরের জন্য মেশিনের তেল আমদানী করার একক লাইসেন্স দেয়া হয়। সে তার এই ইজারাদারী থেকে শতকরা ২৫ ভাগ মুনাফা লুটে। কিন্তু এ তেলে আগুন লেগে পুড়ে যায়।

বর্তমানে আমদানী ব্যবসা রাজনীতির ভিত্তিতে চালু হয়েছে। যাকে লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করা হয় সে তার কারণ জানতে পারবেনা। কেউ এ ধরনের কোনো ভুল করলে (অর্থাৎ কারণ জানতে চাইলে) তাকে ইসরাইলের এজেন্ট গণ্য করে গুলী করে হত্যা করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

এটা একটা নতুন ধরনের শ্রেণী ব্যবস্থা। যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হবে সেখানে জনগণ অসহায় হয়ে পড়বে। আমি পাহলবী ফাউণ্ডেশান সম্পর্কে এক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি রিপোর্ট খোমিনীকে পেশ করেছিলাম এবং এর শোষণ মূলক চরিত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলাম। কিন্তু তিনি তার গুরুত্বই দেননি।

নওবারী একটি চমকপ্রদ ঘটনাও শুনান। ১৯৮০ সালে স্মাগলিংয়ের অভিযোগে চারজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়। এ অপরাধের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। তারা মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খালখালীকে ৫ লাখ ডলার দেয়। পরে তারা ইমাম খোমিনীর কাছে গিয়ে বলে যে, খালখালীকে তারা অর্থ দিয়েছিল 'সাহমে ইমাম' (অর্থাৎ ইমামের অংশ) হিসেবে। কাজেই এ অর্থ ইমামের কাছে আসা উচিত। খোমিনী তো প্রথমে একথা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু অনুসন্ধানের পর কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়। তখন তিনি ভীষণ ভাবে ক্রুদ্ধ হন। তারা আরো বলে যে, ব্যাংকে খালখালীর নামে ৩ কোটি ডলার জমা আছে।

নওবারী বলেন, আলেমগণ বিভিন্ন স্থানে সম্পত্তি কিনতে শুরু করেছেন। এর একটা পদ্ধতি হচ্ছে, তারা আমীরদেরকে তাদের সম্পত্তি আসল দামের অর্ধেক দামে বিক্রি করতে বাধ্য করছেন। তারপর নিজেরা সেগুলো কিনে নিচ্ছেন। মারসেডিজ কারগুলো এখন আর ব্যক্তিগত মালিকানায় নেই। এগুলো চলে গেছে সরকারী তহবিলে। এভাবে এগুলো এখন আলেমগণ ব্যবহার করছেন।

আলেমদের হাতে এখন একটা নতুন অস্ত্র এসে গেছে। এ অস্ত্রটা হচ্ছে রেশন কার্ডের নতুন ব্যবস্থাপনা। সব জিনিসই এখন রেশন কার্ডে পাওয়া যায়। চাউল, চিনি, তেল, ঘি, লবণ, সাবান, পেট্রোল, কেরোসিন, আলু, ডিম, গোশ্ত, দুধ ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার্য দ্রব্যাদি লাভ করার একমাত্র পথই হচ্ছে এখন এই রেশন কার্ড। আর এই রেশন কার্ড জারী করেন উলামায়ে কেরাম। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য বস্তুর পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ তাদের কাজ। সরকারের প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার পরই তার নামে রেশন কার্ড জারী করা হয়। রেশন কার্ডের ওপরই একজন নাগরিকের জীবন নির্ভর করে। আর 'বেলায়েতে ফকীহ' এর সিস্টেম অনুযায়ী মহল্লার বা এলাকার মসজিদের ইমামের হাতে এই রেশন কার্ডের সমস্ত দায়িত্ব। নওবারীর বক্তব্য হচ্ছে, ইরাকের সাথে যুদ্ধের ফলে তেলের ব্যবসায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে একমাত্র খারগ দ্বীপ থেকেই তেল রফতানী করা হচ্ছে। অন্যান্য সমস্ত বন্দরই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর তেল উত্তোলনের পরিমাণও এত বেশী নয় যে,

www.nagorikpathagar.org

তা দেশের চাহিদা পূরণ করার পরে তা বেশী পরিমাণে বিদেশে রফতানী করা যেতে পারে। ন্যাশনাল ইরানিয়ান ওয়েল করপোরেশন থেকে বিদেশী আমলাদেরকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। আর প্রত্যেক নতুন মন্ত্রী নিযুক্তির পর এখানে ছাঁটাই চলে। বর্তমান তেলমন্ত্রী গুরাজী তেল-শিল্প সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখেন না। আর ইরান থেকে যেসব দেশ তেল সংগ্রহ করতো তারা এখন অন্য দেশের সাথে চুক্তি করে নিয়েছে। বিশ্ব বাজারে ইরানী তেলের কোনো চাহিদা নেই।

নওবারী বলেন ঃ ইরানে মজুদ সোনার পরিমাণ ৩০ হাজার ডলারের মুদ্রা-মানের চাইতে অনেক কম। আবার সোনা বিক্রি করার কথাও উঠছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নওবারী যা বলেছেন তেহরানে গিয়েও আমরা তারই প্রতিধ্বনি শুনেছি। 'পাসদারান' ও 'জিহাদী জীবন' ধরনের সংগঠন গুলোতে অনবরত যুবকদের ভর্তি করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করার একটা চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু একথা সহজেই বুঝা যায় যে, এই উৎপাদন বিহীন কর্মসংস্থান দেশের অর্থনীতির বোঝা বাড়াতে পারে, তার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ডলারের মূল্য থেকেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমান করা যায়। সরকারী পর্যায়ে এক ডলারের ৮১ তুমান (১০০ তুমানে এক ইরানী রিয়াল) পাওয়া যায়। অথচ বেসরকারী পর্যায়ে লেনদেন (যা সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষিত হয়েছে) ১ ডলারে তিনশো থেকে সোয়া তিন শো তুমান পর্যন্ত পাওয়া যায়। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় নেই বললেই চলে। এক ব্যক্তি দাবী করে দেশের সার্বিক শিল্প উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগে নেমে এসেছে। পাইকল নামক কারটি প্রথমে দৈনিক ৪ শ' করে তৈরী হতো। বর্তমানে এর উৎপাদন হার দৈনিক ৪০টি। আর তাও বহু কষ্টে বিক্রি হয়। বহির্বানিজ্য কেবলমাত্র একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমদানী ও রফতানী উভয়টিতেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নওবারী তাঁর সাক্ষাতকারে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ এনেছেন জুলুম-নির্যাতন ও অনর্থক বলপ্রয়োগের ব্যাপারে। তিনি এ দাবীও করেছেন যে, বর্তমানে সাভাকের বহু এজেন্ট বর্তমান সরকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন ঃ তেহরানের বর্তমান প্রসিকিউটার হচ্ছেন আসাদুল্লাহ লাজুরবী। তিনি পেশাগতভাবে একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। ইল্‌ম কালামের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআন ও শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে তাঁর পেটে বোমা মারলেও কিছু বেরুবে না। কিন্তু খোমিনীর ভক্ত-অনুরক্ত। ৮ই জুন আমার পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হলো। আমি ফোনে তাঁর সাথে

www.nagorikpathagar.org

যোগাযোগ করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, আপনার এ পদক্ষেপ বেআইনী। ইমামের একটি বাণীর প্রতি ইংগিত করে আমি হেসে বললাম, আপনারা হচ্ছেন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম প্রাণী। তিনি নিশ্চিন্তে জবাব দিলেন, "এটা আমার কাজ নয়, এ হচ্ছে বেলায়েতে ফকীহ।" এর অর্থ হুকুম দিয়েছেন সরাসরি ইমাম খোমিনী। আর বেলায়েতে ফকীহর বিরোধীতা করার মানে হচ্ছে, আপনাকে গুলী করে হত্যা করা যেতে পারে।

১৫ জুন আমি আত্মগোপন করেছিলাম। বনীসদরের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলছিল। ইমাম খোমিনী এক বেতার ভাষণে বললেন, যে ব্যক্তি এ বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এ ফতোয়া সত্বেও ৪ লাখ লোক বিক্ষোভে অংশ নেয়। তারা সংগঠিত ছিলনা। আলেমদের 'হিজবুল্লাহ' নামক সশস্ত্র সংগঠন তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বহুলোক গ্রেফতার হয়। একবার আমি খোমিনীকে বলেছিলাম, মাদ্রাসার মৌলবীদের সম্পর্কে অনেক মজার মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি সংগে সংগেই উত্তেজিত হয়ে ফতোয়া দিলেন ঃ যে ব্যক্তি মাদ্রাসার মৌলবীদেরকে বিদ্রূপ করবে তার বিবি তার ওপর হারাম হয়ে যাবে। হিজবুল্লাহ হচ্ছে ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির সশস্ত্র অংগ সংগঠন। তার শ্লোগান হচ্ছে ঃ হিজ্‌ব ফাকাত হিজবুল্লাহ — রাহবার ফাকাত রুহুল্লাহ। অর্থাৎ হিজবুল্লাহ হচ্ছে একমাত্র দল এবং খোমিনী হচ্ছেন একমাত্র নেতা। ১৯৮১ সালের ৫ মার্চ বনীসদর মরহুম ডঃ মুসাদ্দেকের স্মরণে অনুষ্ঠিত এক সভায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু খোমিনী হিজবুল্লাহর মাধ্যমে আক্রমন চালিয়ে এই সভা পন্ড করে দেন। কারণ, তিনি নেতা হিসেবে আর কারোর নাম শুনতে প্রস্তুত নন।.....নওবারী বলেন ঃ যতদিন বনীসদর ছিলেন ততদিন সরকার আধুনিক উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীটির সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি দাবী করেন, তাঁর জানা মতে বনীসদরের পতনের পর ৩ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। এ সংখ্যা তিনি তেহরান রেডিওর খবর থেকেই তৈরী করেছেন বলে দাবী করেন এবং আসল সংখ্যা নাকি এর চেয়ে অনেক বেশী।

নওবারী জোর-জুলুম ও প্রতিশোধ প্রবণতার উল্লেখ করে বলেন ঃ বিরোধী পক্ষের লাশগুলো কাফেরদের কবরস্তানে ফেলে দেয়া হয়। এমনকি মুসলমানদের কবরস্তান থেকে লাশ বের করে নিয়ে কাফেরদের কবরস্তানে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কারণ ভুলক্রমে প্রথমে তাদেরকে নাকি মুসলমান মনে করা হয়েছিল। যারা বেহেশতী যোহরার সন্নিকটে একটি বিরাট কবরস্তানে বহু ভাঙাচোরা কবর ও সেগুলোর আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো পরিচিতি ফলকগুলো দেখেছেন তারা নওবারীর এ বক্তব্যকে মিথ্যা বলতে পারবেন না।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম খোমিনী সম্পর্কে নিজের মতামত বর্ণনা করে নওবারী বলেনঃ ইরানীরা দীর্ঘকাল থেকে সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন ভোগ করে আসছিল। শাহের কর্তৃত্ব ছিল অবৈধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের যোগসাজসে তিনি সিংহাসন লাভ করেছিলেন। আমরা ন্যায় ও ইনসাফের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ধর্ম ন্যায় ইনসাফ ও বৈধ কর্তৃত্বের জন্য আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করার শিক্ষা দেয়। আমরা মূলগত ভাবে ধর্মীয় জাতি। ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসই আমাদের প্রাণশক্তি এবং সমস্ত কর্মশক্তির উৎস। খোমিনীর চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। শাহের বিরুদ্ধে আক্রোশ তো আমাদের মনে প্রথমেই দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু নেতৃত্বের আসন ছিল শূন্য। খোমিনী তা দখল করেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ন্যায় ইনসাফ, সদাচার, সহানুভূতি, শান্তি, সাম্য, বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়। এখন শাহের স্থানে বসেছেন খোমিনী। সাভাকের জায়গায় এসে গেছে পাসদারান ও হিজবুল্লাহ। সারা দেশে চলছে জোরজুলুমের রাজত্ব।

নওবারী বলেনঃ শাহের আমলে ইমাম খোমিনী লোকদেরকে কামানের গোলার মুখে উড়িয়ে দেয়ার কঠোর নিন্দা করতেন। আর আমি তাঁর এই নিন্দা সম্বলিত বিবৃতিগুলি অতি উৎসাহভরে বিতরণ করতাম। এখন নতুন যুগে ঐ একই দৃশ্য দেখে আমি মহাসংকটে পড়ে যাই। প্যারিসে ইমাম খোমিনী বলতেন, "আমি জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা চাই এবং আমি তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করি।" বর্তমানে এ স্বাধীনতার মৃত্যু ঘটেছে আর মতবিরোধ নিয়ে বেঁচে থাকাও এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। খোমিনী মেয়েদেরকে ভোট দেবার অধিকার দান করার কারণে শাহের নিন্দা করেছিলেন কিন্তু এখন তিনি নিজেই মেয়েদের কাছে ভোট চাচ্ছেন। আমাদের ধারণা ছিল শাহের হাত থেকে মুক্তি লাভের পর রাজনৈতিক বন্দীর অস্তিত্ব থাকবেনা, জোর-জুলুম বন্ধ হয়ে যাবে এবং গুলী করে মানুষকে হত্যা করা হবেনা। কিন্তু ঘটছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

শাসনতন্ত্র তৈরী হলো। তাতে "জাতীয় পরিষদের" উল্লেখ ছিল। ইমাম খোমিনীও তাতে স্বাক্ষর করেন। এখন এ প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে তিনি এর নাম দিয়েছেন "ইসলামী পরিষদ।" প্রথম নামটি ছিল জনগণের প্রতিনিধিত্বের প্রতীক। আর বর্তমানে তা চলছে "বেলায়েত ফকীহ"-এর চিন্তার ভিত্তিতে। এতে আসল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব রয়ে গেছে ইমাম খোমিনীর হাতে। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থায় হয় 'প্রলেটারিয়েটদের একনায়কত্ব' আর এই ব্যবস্থাকে 'ফকীহদের একনায়কত্ব' বলতে পারেন। খোমিনী প্যারিসে

www.nagorikpathagar.org

অবস্থানকালে আমাদেরকে বলেছিলেন, তিনি সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নেবেন না। তিনি একজন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন। কিন্তু তিনিই এখন ইরানের আসল শাসক। দেশের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর কুক্ষিগত। তাঁর এই রাজনৈতিক মর্যাদার সাথে দেশের ৭ জন শ্রেষ্ঠ গণ-প্রতিনিধিত্বশীল আয়াতুল্লাহর মধ্যে তিনি ছাড়া বাকি ৬ জনই দ্বিমত পোষণ করেন। দেশের আলেম সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই একে অসংগত মনে করে। নওবারী ইমাম খোমিনীর দৌহিত্রের বরাত দিয়ে বলেন, তাঁর মতে শতকরা ৯০ জন আলেম ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক নন। তার এ মত ব্যক্ত করার পর এক সপ্তাহ কাল তাকে গৃহে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

নওবারীর মতে ইমাম খোমিনী ছিলেন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং তাঁর সাথে ভক্তি ও প্রীতির নজীরবিহীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তিনি এমন পথ অবলম্বন করেছেন যে পথে অগ্রসর হয়ে ইতিপূর্বে শাহ ইরান নিজের বিরোধিতার বীজ বপন করেছিলেন। তিনি বিরোধী মত প্রকাশের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর সাথে মতৈক্য ও মত-বিরোধ ঈমান ও কুফরীর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তিনি যদি সব দিক দিয়ে জনগণকে ঘিরে ফেলেন তাহলে এর প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদিতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের পথ উন্মুক্ত হবে।

ভবিষ্যতের ব্যাপারে গভীর আশংকা প্রকাশ করে তিনি বলেন ঃ আমার বাস্তব পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, তুদেহ পার্টি সরকারের মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এবং ভবিষ্যতে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তা থেকে একমাত্র রাশিয়াই লাভবান হবে। রাশিয়ানরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে যে, খোমিনীর পর ইরান তাদের কব্জায় চলে যাবে।

আমরা গভীরভাবে অনুভব করি, নওবারীর এ সাক্ষাতকারে এমন বহু তিক্ত ও অপ্রীতিকর বক্তব্য রয়েছে, যা ইরান বিপ্লবের সাথে যাদের আবেগ জড়িত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাদের তীব্র মানসিক পীড়ার কারণ হবে। আমরা নিজেরাও এ বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করতে গিয়ে হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করেছি। কিন্তু আমরা মনে করি, গতকাল পর্যন্তও যারা বিপ্লবের শক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাদের চিন্তা ও অনুভূতি আমাদের সামনে আসা উচিত। তারা বিপ্লবের শত্রু নয় বরং তার ফলাফল তাদের মনে অসন্তোষের বীজ বপন করেছে। তাদের মতামতকে দেশ ও জনগণের শত্রুদের মতামত মনে করে উপেক্ষা করা উচিত নয়। ইমাম খোমিনী ও তাঁর সাথীদেরও এই বিরুদ্ধপক্ষীয় মতামতকে পূর্ণ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত। বিপ্লব ও ইরান উভয়ের কল্যাণ এরই মধ্য নিহিত বলে আমরা মনে করি। নওবারী যে শ্রেণীটির সাথে সম্পর্ক রাখেন বিপ্লব

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপ থেকে তাদেরই কাঁধে ভর করে ইরানে এসেছে। তাকে সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষা করা মানেই হচ্ছে নিজেদের শক্তির একটি অংশ কেটে বাদ দেয়া এবং তাকে দুশমনের হাতে তুলে দেয়া।

বিপ্লবের পশ্চাতে

বিপ্লবের পর ইরানে যে শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে তার প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর জনাব আলী রেজা নওবারীর মন্তব্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবার আমরা এমন কিছু লোকের মতামত পেশ করতে চাই যারা আজকের ইরানের বাসিন্দা, শাহের আড়াই হাজার বার্ষিকীর জাঁকালো উৎসব যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তার কর্তৃত্বের সূর্যকে যারা মধ্যগগণে কিরণ দিতে তারপর ধীরে ধীরে তাকে অস্তাকাশে ঢলে পড়তে দেখেছে, ইরানের নির্জন প্রান্তরে ও কবরস্তানের মৃত্যুনীরবতার জোশ ও আবেগের তুফান সৃষ্টি হতে এবং বুদ্ধি ও যুক্তির সব গ্রন্থী ছিন্ন হতে দেখেছে, শাহকে দেশ থেকে চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে যেতে ও রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ প্রাচীর গুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো হতে দেখেছে। ১৪ বছর দেশান্তরে থাকার পর বিজয়ীর বেশে আয়াতুল্লাহ খোমিনীকে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসতে দেখেছে, ২০ লাখ জনতার মহাসমুদ্রকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকতে ও একজন চীর বাস পরিহিত দরবেশকে ইতিহাসের নজির বিহীন অভ্যর্থনা জানাতে দেখেছে। তারপর তারাই দেখেছে পুরাতন ব্যবস্থার পরিচালকদেরকে তাদের নিজেদের ব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হতে এবং সেস্থলে একটি নতুন ব্যবস্থার জন্ম নিতে। গত চার পাঁচ বছর থেকে প্রতিদিন নতুন দৃশ্য স্ক্রীনের পর্দায় ভেসে উঠতে দেখেছে তারা। এসব অসংখ্য দৃশ্য তাদের মনের পর্দায় এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের অধিকাংশই বিস্ময়ে অভিভূত। তবে দৃশ্যগুলো এমনভাবে একটার সাথে আর একটা মিশে গেছে যে তাদের আলাদা আলাদা চিত্র মানসপটে ধরে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সেগুলো তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অতীত বর্তমান কোনোটাই তাদের সামনে সুস্পষ্ট নেই। তাদের মন-মানস ও চিন্তা বিভ্রান্ত। তারা এখন দৃশ্যগুলোর চারপাশের আবরণ ভেদ করার চেষ্টা করছে।

এখানে যেসব লোকের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি তারা অদ্ভুত চিন্তা-বৈষম্যে ভুগছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মত আলাদা। তবে একটি ব্যাপারে তারা সবাই একমত যে, ঘটনাটি ছিল সত্যিই বিরাট। এ ব্যাপারে সারা দুনিয়াও তাদের সাথে একমত।

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব সম্পর্কে কে কি বলে, কার কি অভিমত তা অবশ্যি শুনা উচিত। এর মধ্যে অনেকগুলো নিছক চিন্তা বৈকল্য হতে পারে। অনেকগুলো বাজে কথাও হতে পারে। কিন্তু এসব শুনতে তো কোনো বাধা নেই। ঘটনাস্থলে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের অভিমতের একটা গুরুত্ব আছে। তবে শ্রোতা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বুদ্ধি, যুক্তি ও বাস্তবতার কষ্টি-পাথরে তাকে যাচাই করে। কিন্তু যদি এসব কথা না শুনা হয় তাহলে একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসল ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক রায় কায়েম করতে পারবেনা। আমি যা কিছু শুনেছি তা মিথ্যা, সত্য, ধারণা, আন্দাজ, অনুমান ও আশংকার মিশ্রণ। তা থেকে সত্যকে ছেঁটে বের করতে হবে। আমি যা শুনেছি তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) এসব কিছু আমেরিকা নিজেই করিয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা এর সত্যতা প্রমাণ করে। শাহ নিজের আত্মজীবনী ও সাক্ষাতকারে এমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এসব কিছুর জন্য আমেরিকাকে দায়ী করেছেন। বিপ্লবের পূর্বে ন্যাটোর মার্কিন সেনাদলের প্রধান সেনাপতি দেড়-দু'মাস তেহরানে এসে ছিলেন এবং গোপন তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি শাহের সাথে একবারও সাক্ষাত করেননি। বিপ্লবীদের সাথে তার গভীর যোগাযোগ ছিল। আমেরিকা শাহকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছিল। কারণ শাহ ধীরে ধীরে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। তিনি সোভিয়েটের এশীয় শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অথচ পাকিস্তান তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভারতের ন্যায় সোভিয়েট তল্পীবাহক দেশও এ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। শাহ রাশিয়াকে ইরানী গ্যাস সরবরাহ করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এ গ্যাস সরবরাহ জারী ছিল। এছাড়া রাশিয়ার সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদিত হয়। আমেরিকার সাধারণ দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে পরিপূর্ণ প্রাধান্যর চাইতে সামান্য কিছু কমের ওপর সে রাজী হয়না। তার তল্পীবাহক কোনো রকম তেরিমেরি করলে বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালালে সে তখনই তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার চেষ্টা করে। সারা দুনিয়ায় এ ব্যাপারে তার এই একই নীতি দেখা যায়। কাজেই শাহের ব্যাপারেও সে সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছিল। তার কামনা ছিল, শাহ চলে যাবে এবং সেনাবাহিনী তার স্থান দখল করবে। এভাবে নতুন সামরিক সরকার সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে সে গোপনে বিপ্লবী শক্তিগুলোকে সহায়তা দান করেছে এবং শাহকে-কোনো সাহায্য করেনি। তার আশা ছিল, ধর্মীয় গ্রুপের আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও বিভিন্ন মুসলিম দেশের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী

www.nagorikpathagar.org

দেশের বিশৃংখলাকে বাহানা বানিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় এসে যাবে। পরিস্থিতির এ গতি পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে ধর্মীয় গোষ্ঠীর আন্দোলন মাঠে মারা যাবে এবং সেনাবাহিনী ক্রমান্বয়ে তাদের কর্তৃত্ব শক্তিশালী করে ফেলবে। শাহের প্রতি আমেরিকার বিরূপতার প্রমাণ হচ্ছে, দেশ ত্যাগের পর আমেরিকায় অবস্থানকালে শাহের সাথে তার ব্যবহার। শাহের ব্যাপারে আমেরিকা অত্যন্ত নীরব ভূমিকা পালন করেছে। ফলে তিনি এক দেশ থেকে আর এক দেশে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অবশেষে ফেরাউনের দেশে এসে উঠেছেন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ করেছেন।

এ অভিমত প্রকাশকারীরা এ কথাও বলে থাকে, বিপ্লব আন্দোলন চলাকালে ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে শিক্ষারত ছাত্রদের তৎপরতা ও প্যারিসে ইমাম খোমিনীর অবস্থান কালে পাশ্চাত্যের ব্যবহার তাঁর সাথে ছিল সহানুভূতিমূলক। পাশ্চাত্য প্রেস এর পাবলিসিটির ব্যাপারে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখিয়েছে। আমেরিকার কামনার বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছিল তা হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ময়দানে নামেনি এবং শাহের বিদায়ের পরই নতুন সরকারকে সে গ্রহণ করে নিয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংঘাতের বিভিন্ন পর্যায়ে আমেরিকা চেষ্টা করেছে যে কোনো প্রকারে ক্ষমতায় এসে যাক। শাহের শেষ প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ার ইমাম খোমিনীর আগমন কালে যখন কারফিউ জারী করলেন এবং খুব লাফালাফি করতে থাকলেন, আমেরিকার সংবাদপত্র-সমূহ ভবিষ্যৎ বাণী করলো ঃ 'ব্যাস, এবার সেনাবাহিনী ক্ষমতায় এসে যাচ্ছে'। কিন্তু তাদের এ আকাংখা পূর্ণ হলোনা। আমেরিকান গবুচন্দ্ররা নিজেদের রাজনৈতিক ঘুটি চালবার সময় যে হিসেব করেছিল তাতে ইমাম খোমিনীর আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, এ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব সুলভ তেলেসমাতি প্রভাব, শীয়া আকীদায় শাহাদত লাভের জযবা ও উদগ্র কামনা, ইমামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রীতি-আনুগত্য ও ইমামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রচন্ড আন্তরিক বাসনা, একক নেতৃত্বের শক্তি এবং তওহীদ বিশ্বাসের মাহাত্ম সঠিকভাবে অনুমান করতে পারেনি। তারা শাহের সাথে বিরোধ করার ও শাহকে ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ধর্মীয় জোশ ও আবেগ-উদ্দীপনাকে নিজেদের পক্ষে ভালো মনে করেছিল এবং নিজেদের ক্রীড়নক হিসেবে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তারা ধারণাই করতে পারেনি, এ ক্রীড়নকরা নিজেরাই বিজয়ীর আসনে গিয়ে বসবে, সব কলকাঠি নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং আর কারোর কোনো পরোয়াই করবেনা।

এ বিপ্লবের পেছনে যারা আমেরিকার হাত দেখেছে তাদের আশংকা, আমেরিকা এখনো যে কোনো মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে দিয়ে তাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতায় বসাবার চেষ্টা করবে। (সম্প্রতি খবর এসেছে ইরানী সেনাবাহিনীর সাবেক জেনারেল কাযেম দেশের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং তিনি সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করছেন। এদিকে দেশের বাইরে ইরানী সেনাবাহিনীর সাবেক, রিটায়ার্ড ও পলাতক অফিসাররা সশস্ত্র কার্যক্রম চালাবার জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করছে।) তারা ইরানের ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে বুকিয়ে দিতে রাজী নয়। ইরানের শুধু তেলই নয় তার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানও আমেরিকার প্রয়োজন। আমেরিকার সমস্যা হচ্ছে, আজকাল তার ভাগ্যটা বড় খারাপ যাচ্ছে। তার সব চাল উল্টে যাচ্ছে। সব কৌশল ভেস্তে যাচ্ছে। ইরানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইরাককে সে ময়দানে নামিয়েছে। এভাবে যুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষতির মাধ্যমে ইরানে আভ্যন্তরীন বিশৃংখলা সৃষ্টি তার লক্ষ্য। কিন্তু এর ফল উল্টো হয়েছে। ইরানী জাতি আরো বেশী শক্তিশালী, সংগঠিত ও উত্তেজিত হয়েছে এবং যে সেনাবাহিনীকে আমেরিকা তেহরান দখল করার কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল তারা এখন চলে গেছে রাজনীতির মূল কেন্দ্র থেকে বহুদূরে সীমান্তে। বিভিন্ন এলাকায় এখন তারা শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। এ সেনাবাহিনীর এখন আর কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের যোগ্যতা নেই। এভাবে বিপ্লবী সরকার একটা বড় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

আমেরিকাকে ইরান বিপ্লবের চালিকা শক্তি গণ্য করা আমাদের মতে কবিতার কল্পরাজ্যে বাস করার মতোই। অনেক টেনে হিচড়েও এর সূত্র মেলানো সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, এতটুকু বলা যেতে পারে, পরিবর্তনের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেই সে নিজের স্বার্থের প্রেক্ষিতে নতুন শক্তিগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। পতনশীল দেয়ালকে ঠেকো দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখাকে অর্থহীন মনে করেছে। পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের মতলবী শাসককে ক্ষমতায় বসাবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যিম্মী সংকট সৃষ্টি না হলে সম্ভবত আজ ইরান-মার্কিন সম্পর্ক অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা ছাড়া ইরানে আমেরিকার আজ আর কিছু করার কোনো ক্ষেত্র নেই। কিন্তু ইরান-ইরাক যুদ্ধ সে সম্ভাবনাও খতম করে দিয়েছে। সম্ভবত আমেরিকা আর এখানে কিছুই করতে পারবেনা। তবে তার পক্ষে চুপ করে বসে থাকাও সম্ভব নয়।

(২) ইরান বিপ্লব সম্পর্কে তেহরানের বিভিন্ন মহলে দ্বিতীয় যে মতটি প্রবল তা হচ্ছেঃ সমস্তই রাশিয়ার কারসাজি। জারের আমল থেকেই ইরান রাশিয়ার নজরে কাঁটার মতো বিঁধছে। রাশিয়ার সেনাবাহিনী বার বার ইরান আক্রমণ করেছে। এবং ইরানী এলাকা দখল করেছে। ইরান তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং কৃষির দিক থেকেও উর্বর এলাকা। এর

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রোপকূল উষ্ণ পানির এলাকায় অবস্থিত। তেল ব্যবসায়ের পথ এই সমুদ্র এলাকা দিয়ে গিয়েছে। এর সীমান্ত আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুরস্ক ও ইরাকের মতো মুসলিম দেশগুলোকে স্পর্শ করেছে। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি থাকবে আমেরিকার কব্জায় এবং তাকে এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হবে এটা রাশিয়া কেমন করে বরদাশত করতে পারে ?

রাশিয়া মুসাদ্দেকের আমলে একটা পরীক্ষা চালিয়েছিল। কিন্তু কুমের ধর্মীয়-গোষ্ঠী বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ কাশানী দাবার সব খুঁটি উল্টে দিয়েছিলেন। শাহ বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। সেবারে প্রমাণ হয়েছিল, রাজনৈতিক দলগুলি বা শাহ ইরানের আসল শক্তি নয়, শাহকে সিংহাসনে বসাবার বা সিংহাসন থেকে নামাবার শক্তি আছে একমাত্র উলামায়ে কেরামের। কাজেই পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য একদিকে আলেমদের শক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলো এবং অন্যদিকে শাহের সাথে সম্পর্ক যোগাযোগ বৃদ্ধি করে তাকে আমেরিকা থেকে আলাদা করার ও তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত করে দেবার প্রচেষ্টা চলতে লাগলো।

ইমাম খোমিনীর ১৪ বছর বাগদাদ অবস্থানের ব্যাপারে এ মহলটি একটি অভিনব তত্ত্ব পেশ করেছেন। এদের বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম যে আসলে বাগদাদে অবস্থান করছিলেন সে আমলটা ছিল ইরাকের ওপর রাশিয়ার পূর্ণ কর্তৃত্বের আমল। রাশিয়ার সম্মতি ছাড়া তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারেন না। তাঁর সাথে রাশিয়ার কোনো সরাসরি সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল কিনা এ প্রসংগ বাদ দিলেও বলা যায়, ইরাক সরকারের যোগাযোগ ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাশিয়ার অনুমোদন ও নির্দেশের সাথে সম্পর্ক বিহীন হতে পারেনা। ইমাম খোমিনী নিজের আন্দোলনকে অগ্রসর করার জন্য বাগদাদের আশ্রয়স্থল থেকেই ইরানের ভেতরে ও বাইরে যোগাযোগ, বাণী প্রেরণ, নির্দেশ দান ও অনুশীলনের যে ব্যাপক সিলসিলা জারী করেছিলেন তা ইরাক সরকার ও রাশিয়ার অজ্ঞাতসারে চলছিলনা। এ শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে তারা সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করেছিল।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ ও তার ভূমিকা আলোচনা প্রসংগে যে সব যুক্তি পেশ করা হয় তার মধ্যে একটি অন্যতম যুক্তি হচ্ছে, রাশিয়া আজ পর্যন্ত কোনো মুসলিম দেশের ধর্মীয় শ্রেণীর নেতৃত্ব ও তার রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতি সমর্থন জানায়নি। বরং তার নির্দেশ, পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যের আওতাধীনে কর্মতৎপর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল হামেশা ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করে এসেছে, ধর্মীয় শ্রেণীর কঠোর বিরোধিতা করে এসেছে, তাদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে রক্ষণশীল গণ্য করে জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু ইরানের ব্যাপারে তাদের কর্ম পদ্ধতি বিস্ময়কর ভাবে বিপরীতধর্মী। সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট দেশের প্রেস এবং পশ্চিমের তাদের সহমর্মী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও সংগঠনগুলো "ইসলামী বিপ্লবের" প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। এমন কি আমেরিকায় বামপন্থীদের তিনটি বিশিষ্ট পত্রিকা 'ডেলী ওয়ার্ল্ড', 'গার্ডিয়ান' ও সাপ্তাহিক 'পিপলস' এ বিপ্লবের পক্ষে বিপুল উৎসাহে কাজ করে গেছে। তারা একে ইরানের কৃষক-শ্রমিকদের কৃতিত্ব গণ্য করে পিপলস (তুদেহ) পার্টির বিপ্লবী কর্ম তৎপরতার প্রশংসা করেছে। রাশিয়ার নিজের ভূমিকা এ ব্যাপারে ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর। তার নিজের সীমান্তের ওপারে এবং ধর্মীয় উলামা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে যে বিপ্লবটি সংঘটিত হচ্ছিল সে ব্যাপারে সে নিজে ছিল নীরব। তার এ দৃষ্টিভংগীতে কয়েকটি বিস্ময়কর দিক রয়েছে। একদিকে সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্ট প্রেস ও বামপন্থী সংগঠনগুলো ইরানের 'ইসলামী বিপ্লবের' প্রতি সমর্থন জানাচ্ছিল আবার অন্য দিকে সোভিয়েট সরকার শাহের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ইসলামী বিপ্লবের মুখপত্র 'ইসলামিক রিভলিউশন' এর ১৯৭৯ সালের আগষ্ট সংখ্যার রিপোর্ট অনুযায়ী রাশিয়া শাহের সাথে কেবল ভালো সম্পর্কই বজায় রাখেনি বরং তাঁকে নিজের দেহরক্ষী বাহিনীকে সশস্ত্র করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ ও গাড়ী সরবরাহ করার প্রস্তাবও দিয়েছিল। হাসানাইন হাইকেল তাঁর 'আয়াতুল্লাহর প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে নিজের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও দরবারের উন্নততর মাধ্যমের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ শেষ দিনগুলোয় শাহের নিকটতম বন্ধুত্ব কেবলমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ব্লাদিমির ভিনোগ্রাদোফের সাথেই রয়ে গিয়েছিল। তিনি সপ্তাহে শাহের সাথে অন্তত একবার এবং কখনো কখনো প্রতিদিন দেখা করতে আসতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সাথে অবস্থান করতেন। শাহ একবার তাকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে এ প্রশ্নও করে বসেন, "তুমি আমার জন্য কি করতে পারো"? একদিকে শাহের সাথে সোভিয়েট সরকারের এই পর্যায়ের বন্ধুত্ব আর অন্যদিকে বিপ্লবী শক্তিগুলোর প্রতি বিশ্ব কমিউনিষ্ট লবীর ঘনিষ্ঠ সমর্থন একটি দুর্বোধ্য ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। তেহরানের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরাও অবাক বিস্ময়ে দেখছিলেন, খোমিনীর আগমনে যে অভ্যর্থনা দেয়া হচ্ছিল তার মধ্যে লেনিন ও ট্রটস্কির বই, মার্কসবাদ সম্পর্কিত পুস্তিকা ও কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের ছবি হাজারে হাজারে বিলি করা হচ্ছে।

১৯৭৯ সালে ১৯ নভেম্বর কার্টারের হুমকির জবাবে রাশিয়া প্রথমবার মুখ খোলে। ব্রেজনেভের এই মর্মে একটি হুঁশিয়ারী প্রচার করা হয় ঃ যদি

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে রাশিয়া তাকে নিজের নিরাপত্তা বিরোধী মনে করবে। যারা ইরান বিপ্লবে রাশিয়ার হাত আছে বলে দাবী করেন তারা তুদেহ (পিপলস) পার্টির ভূমিকার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়। তারা বলেন, তুদেহ তো সবসময় ওলামা ও ধর্মীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছে। আজ তারা কোথায় ? বিপ্লবের সময় তারা কি করছিল ? তারা কি উদ্দেশ্যে ও কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলামী বিপ্লবের সাথে সহযোগিতা করেছে ? আর বিপ্লবের পর পথে ও অলিতে গলিতে কমিউনিষ্ট সাহিত্য স্বাধীনভাবে বিক্রি ও বিতরনের দৃশ্য আমরা দেখেছিলাম কেমন করে ? তারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী জানিয়ে বলেন, আমরা তুদেহ পার্টির যে সমস্ত মুখচেনা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদের এখানে বছরের পর বছর কাজ করতে দেখেছি এখন তাদেরকে দেখছি ইসলামী বিপ্লবের সারিতে।

হাসনাইন হাইকেলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাশিয়া এই বিপ্লবকে তার প্রলেতারী (সর্বহারা) বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করছে। তার বিশ্বাস, পরবর্তী বিপ্লব হবে ধর্মহীন। এজন্যই সে তুদেহকে উলামা গোষ্ঠীর সাথে লাগিয়ে দিয়েছে। এর পর তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারের মধ্যে অবস্থান করে এমন পদক্ষেপ নেবে যার ফলে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে গণমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এই প্রতিক্রিয়ার এক পর্যায়ে এসে যখন শক্তিশালী ও সক্রিয় রূপ নেবে তখন তারা তার সাথে শামিল হয়ে যাবে এবং নিজেদের আসল বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে।

হাসনাইন হাইকেলের মতে ভবিষ্যত ইরানে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের আলামত সুস্পষ্ট। তবে তাঁর মতে এ পর্বটা রাশিয়ার জন্য অতটা সহজ হবেনা। ইরানীরা অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং কট্টর ইসলাম প্রিয়। তারা শাহাদতের জযবায় উদ্বুদ্ধ। একা তুদেহ পার্টি সেখানে কিছুই করতে পারবেনা। রাশিয়া সরাসরি সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে তার উদ্দেশ্য সফল করার কথা চিন্তাই করতে পারবেনা।

রাশিয়া ইরান সম্পর্ক বর্তমানে বন্ধুত্ব ও বিরোধের জটিল পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকীতে রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশগুলো থেকে যে অভিনন্দন বার্তা পাওয়া গেছে তাতে বিপ্লবের প্রতি সমর্থন ও নতুন সরকারের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার গভীর সম্পর্কের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তেহরানে রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ বেলায়েতীকে যে সম্বর্ধনা দেয়া হয়, তাতে রাষ্ট্রদূতদের প্রতিনিধিত্ব করেন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত। তিনি নিজের বক্তৃতায় বিপ্লবকে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানান।

এদিকে আফগানিস্তানে রুশ হামলার বিরুদ্ধে খোমেনীর বক্তব্য অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। তিনি ১০ লাখ মুহাজিরকে ইরানে আশ্রয় দিয়েছেন। রাশিয়ার তীব্র নিন্দা করেছেন। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দাবী করেছেন। শাহের যুগে রাশিয়ায় গ্যাস সরবরাহের সিল-সিলা চালু হয়ে গিয়েছিল। ইমাম খোমিনী তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ বছর বিপ্লব বার্ষিকীতে 'আমেরিকা মুর্দাবাদ' এর সাথে সাথে 'রাশিয়া মুর্দাবাদ' এর ধ্বনিও অনবরত চলেছে। আবার মার্চ পাণ্ট এর সময় সৈন্যরা মাটিতে বিছানো আমেরিকান পতাকার সাথে সাথে রাশিয়ান পতাকাও মাড়িয়ে চলেছে। অবশ্য রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের প্রতিবাদের পর রাশিয়ান পতাকা উঠিয়ে নেয়া হয়। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ আলী আকবর বেলায়েতী এক বিবৃতিতে বলেন, এটা সরকারের পলিসি বিরোধী কাজ ছিল। প্রশ্ন হলো, এ কাজটা যদি সরকারের পলিসি বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের কাজ করার সাহস করলো কে ? কার উদ্দেশ্য কি ছিল ? এমন তো নয়, পাসদারানদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট তুদেহ পার্টির লোকেরা রাশিয়াকে ক্ষেপিয়ে তোলার এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে এমনটি করেছিল ? আর মুরগে বার শোরদী "রাশিয়া ধ্বংস হোক" এর ধ্বনিও এ উদ্দেশ্যেই দিয়েছিল ?

আফগানিস্তানে বর্তমানে রাশিয়ার যত সৈন্য আছে তার বৃহত্তম অংশ ইরান সীমান্তে আস্তানা গেড়েছে। এখানে রাশিয়ার ১২ ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। সম্প্রতি টাইমস সাময়িকী ইরানী বেলুচীস্তান এলাকায় রাশিয়ার যে গোয়েন্দা ঘাঁটির খবর দিয়েছিল, যদিও তার প্রতিবাদ এসে গেছে, তবুও বলা যায় রাশিয়া ঐ এলাকায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এখন তার দৃষ্টি ইরানী ও পাকিস্তানী বেলুচীস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে উষ্ণ পানির সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছেছে। ম্যাপ সামনে রাখলে দেখা যাবে, আফগানিস্তানের অধীনস্থ এলাকা ও তার সংশ্লিষ্ট সোভিয়েট এলাকা থেকে ইরানী বেলুচীস্তানের মধ্য দিয়েই সমুদ্র সবচেয়ে নিকটবর্তী। এ এলাকায় নিজের তৎপরতা চালাবার জন্য রাশিয়া বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে।

১) একদিকে এ গুজব রটানো হয়েছে এবং ভারতের প্রেসকেও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যে, ইরানে সামরিক তৎপরতা চালাবার জন্য পাকিস্তান আমেরিকাকে বেলুচীস্তানের মধ্যে স্থল, আকাশ ও সামুদ্রিক ঘাঁটি স্থাপন করার অনুমতি দিয়েছে।

২) আফগানিস্তানে রাশিয়ার সামরিক কর্মকান্ডের পটভূমিতে সম্প্রতি পাকিস্তান আমেরিকা থেকে সমরাস্ত্র ক্রয়ের জন্য যে চুক্তি করেছে তাকে ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে।

৩) ইরানী ও পাকিস্তানী বেলুচীস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে বৃহত্তর বেলুচীস্তানের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৪) ইরানী বেলুচীস্তানে সুন্নীদের প্রাধান্য। তাই সেখানে শিয়া-সুন্নী বিরোধ বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সুন্নীদের ওপর ইরান সরকারের নির্যাতনের কাহিনী তৈরী করে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয়েছে।

৫) আফগানিস্তানের ঘটনার পর পাকিস্তানী বেলুচীস্তানের জনগণ যেহেতু রুশীয় প্রপাগাণ্ডার মর্ম বুঝতে পেরেছে এবং রাশিয়ার আসল উদ্দেশ্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তাই তাদের মধ্যে ভীতি ও সন্ত্রাস ছড়াবার এবং নিজেদের শক্তির প্রদর্শনী করার জন্য বার বার বিমান হামলা চালানো হচ্ছে।

৬) ইরান-পাকিস্তান সীমান্তে গোয়েন্দা ঘাঁটির অন্তরালে আসলে নিজের সামরিক ঘাঁটি বসাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে ঠিক কেন্দ্রস্থলে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রস্তুতি চলছে।

৭) ইরান ও পাকিস্তান যাতে ভবিষ্যতে কোনো যুগ্ম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর না হয় এজন্য উভয় দেশের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৮) একটি খবর হচ্ছে, মুহাজিরদের ছদ্মাবরণে রাশিয়া তার বহু চর পাকিস্তান ও ইরানে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। তারা ভবিষ্যতের ক্ষেত্র তৈরী করছে। তারপর পরিবেশ অনুকূলে এসে গেলে ওদিকের ইশারায় সংগে সংগেই নিজেদের কাজ শুরু করে দেবে।

৯) এই ময়দানে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শক্তি যাতে বৃদ্ধি হতে না পারে সেজন্য তার সীমান্তে ভারতের চাপ কেবল বজায় রাখাই নয় বরং অনবরত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনাক্রমন চুক্তি আলোচনা মুলতবী হবার পেছনে রাশিয়ারই হাত সক্রিয় রয়েছে। এমন কি ভারতীয় প্রেস ও এজন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছে।

১০) রাশিয়া তার সমর্থক শক্তিগুলোর সহযোগিতায় পাকিস্তানে আভ্যন্তরীন নৈরাজ্য সৃষ্টিরও চেষ্টা চালাচ্ছে। কাবুলে ধ্বংসাত্মক ও গোপন তৎপরতা চালানোর অনুশীলন দানের যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সরাসরি রাশিয়ার পরিচালনাধীন রয়েছে। পাকিস্তানে এ পর্যন্ত যত গোপন অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার অধিকাংশই রাশিয়ার তৈরী।

আলামত ও লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, রাশিয়ার আসল আগ্রহ ইরানী বেলুচীস্তানের ব্যাপারে। এ পথে সে সহজে ও দ্রুত সমুদ্রে নামতে পারে। কিন্তু এ এলাকাটা দখল করতে হলে পাকিস্তানকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আবার এ উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে সব সময় একটা অনাস্থা জিইয়ে রাখতে হবে। এ দুটো দেশের মধ্যে সব সময় আভ্যন্তরীন বিশৃংখলা

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সংগে পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের চাপ বাড়াতে হবে।

তেহরানে যারা এ বিপ্লবের পেছনে রাশিয়ার হাত আছে বলে দাবী করেন তাদের আর একটা বক্তব্য হচ্ছে, এ বিপ্লবের সময় যে সুসংগঠিত প্রপাগান্ডা চালানো হয় তার সমস্ত টেকনিক রাশিয়ার কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। তাতে খোমিনীর ছবি, তাঁর বাণী সম্বলিত পোষ্টার, পুস্তিকা, ফেষ্টুন, ব্যানার, ব্যাজ, বোতাম, বিরোধীদের কার্টুন ও তাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত শ্লোগান—সব কিছুতেই পুরো কমিউনিষ্ট টেকনিক ব্যবহার করা হয়। আবার নতুন ব্যবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারী জেনারেলের ন্যায় সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বকে অতি প্রাকৃতিক পর্যায়ে পৌঁছানো হয়েছে, তার পেছনে প্রেসিডিয়ামের মতো একটা প্রতিষ্ঠান বসানো হয়েছে, তাকে দেশের সবকিছুর মালিক বানানো হয়েছে এবং বিরোধীদেরকে শেষ করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে—সবকিছুর মধ্যে যে চরিত্র ফুটে উঠছে তা সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ বিপ্লবের পরিকল্পনা তৈরীতে কমিউনিষ্ট মস্তিষ্ক সক্রিয় রয়েছে। তারা একথা বলেন, পাসদারানদের হাতে যেসব অস্ত্র রয়েছে তার অধিকাংশই কমিউনিষ্ট দেশগুলো থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। তাদের আর একটি যুক্তি হচ্ছে, মার্কিন দূতাবাস দখলকারী ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল তুদেহ পার্টির অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার ইংগিতে তারা সমঝোতার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। এর ফলে ইরান অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় অশান্তি ও বিশৃংখলা। বর্তমানে এ থেকে একমাত্র রাশিয়াই লাভবান হচ্ছে।

এ মতটিকে আমরা যতটুকু গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে, এ বিপ্লবকে নিজের পথে পরিচালনার জন্য রাশিয়া তুদেহ পার্টিকে বিপ্লবের সাথে শামিল করে এবং তাকে নিজের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার লাইন দেয়। ভবিষ্যতের জন্য রাশিয়ার পক্ষ থেকে যে বিপদের ঘন্টা বাজানো হচ্ছে তাও ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এ বিপ্লবের পেছনে রাশিয়ার হাত ছিল একথা আমরা মানতে প্রস্তুত নই। চিন্তা, আকীদা-বিশ্বাস, প্রাণ-শক্তি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে এটি একটি ইসলামী বিপ্লব। রাশিয়া এ বিপ্লবটি সৃষ্টি করেছে এবং এর সাথে ইমাম খোমিনীর সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে করার আসলে কোনো ভিত্তি নেই। একথাটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মনে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, ইসলামের সাথে বিপ্লবের কি সম্পর্ক? বিপ্লব তো কমিউনিষ্ট ভাবধারার একচেটিয়া সম্পত্তি। রক্ষণশীল ইসলামের মধ্যে এ শক্তি কোথায়? এই বিপ্লবের ফলে বিংশ-শতকের

www.nagorikpathagar.org

বুকে ইসলামের শক্তির ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চোখে নতুন আশার আলো ফুটেছে, ইসলামী আন্দোলনগুলো নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেছে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো হিম্মতহারা হয়ে পড়েছে। এগুলিই এর ইসলামী বিপ্লব হওয়ার প্রমাণ। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত ও হিম্মতহারা করার জন্য এর বিরুদ্ধে দুটো প্রচারণা জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছে। এক, ইরান বিপ্লব একটা খালেস শিয়া বিপ্লব। সাধারণ মুসলমানদের এ থেকে নেবার কিছুই নেই। বরং তাদের জন্য এটা একটা ফিতনা ও বিপদ। দুই, এ বিপ্লব যদি কোনো বিরাট কার্য সম্পাদন করে থাকে তাহলে তার কৃতিত্ব মৌলবী-দেরকে দেবার দরকার কি? এর সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে কমিউনিষ্ট তুদেহ পার্টির। আসল কাজ তারাই করেছে আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে কৃষক-মজুররা। একাজ তো আসলে রাশিয়া করেছে। মৌলবী সাহেবান ও তাদের নেতৃত্বে যে সব ছাত্র ও যুবকরা কাজ করেছে তাদেরকে তো আসলে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যের কাজকে এভাবে নিজের কৃতিত্ব হিসেবে জাহির করার এটা একটা পুরাতন জঘন্য মনোবৃত্তি এবং এই সংগে মুসলমানদেরকে ইসলামের আন্দোলন মুখর শক্তির প্রতি বিরূপ ও আস্থহীন করে দেবার একটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়া এবিপ্লব থেকে ফায়দা উঠাতে চায়, একথা ঠিক। তবে রাশিয়া এ বিপ্লব এনেছে একথা মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা, এর চেয়ে বড় মিথ্যা আজকে দুনিয়ার আর দ্বিতীয়টি নেই।

ইরান বিপ্লবের নৈতিক মান

রাশিয়ার সাথে বর্তমান ইরান সরকারের গোপন সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে অনেকে বলেন: আরবদের মধ্যে সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ ও লিবিয়ার কর্ণেল কাযাফীর সাথেই মাত্র এই সরকারের বন্ধুত্ব আছে। আলজিরিয়া সরকারের সাথে অপেক্ষাকৃত কম গভীর পর্যায়ের একটা বন্ধুত্বও আছে। তবে এ সরকাগুলো সবই সোভিয়েট ব্লকের সাথে সম্পর্ক রাখে। সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ সরকার ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে যে ব্যবহার করছে তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে তার সাথে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী সরকারের এই গভীর সম্পর্ক বড়ই দুর্বোধ্য ঠেকে।

আপাত দৃষ্টিতে এ যুক্তিটি বড়ই শক্তিশালী মনে হয়। কিন্তু এর আসল পটভূমি হচ্ছে, ফিলিস্তিনের মুক্তি ফ্রন্টের সাথে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের গভীর সম্পর্ক ছিল। এ বিপ্লবের জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ এবং বিপ্লবের পর 'পাসদারান'দের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনে ফিলিস্তিনীরা বিরাট অবদান রেখেছে। ইমাম খোমিনী

www.nagorikpathagar.org

ও বিপ্লবের অন্যান্য নেতাদের সাথে ইয়াসির আরাফাতের নিকটতম সম্পর্ক ছিল। আরব দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বের প্রশ্নে এসংগঠনটি ব্যাপক প্রভাবের অধিকারী। খোমিনী ইসরাইলকে ধ্বংস করার কথা বলেন ঃ যেসব আরব দেশের বক্তব্য তাঁরই মতো কঠোর এবং ফিলিস্তিনীদের সাথে যাদের সম্পর্কও গভীর তারাই ইরানের বন্ধু।

সিরিয়ার প্রসংগে বলা যায় সউদী আরবেরও তার সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অথচ সউদী আরব সোভিয়েট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মার্কিন ব্লকের সাথে সম্পর্ক রাখে। ইথওয়ানের বিরুদ্ধে জুলুমের ব্যাপারে সেও প্রতিবাদী কণ্ঠ। কাজেই আরব ইসরাইল বিরোধের পটভূমিতেই এই সম্পর্কের প্রকৃতি বিচার করা উচিত।

সন্দেহ নেই বিপ্লবের জন্য যে টেকনিক অবলম্বিত হয়েছিল, গণ-সংযোগের জন্য প্রপাগাণ্ডা ও পাবলিসিটির যে পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছিল, পাসদারানের ট্রেনিং, অস্ত্র শয্যা ও সংগঠনের যে ধারা দেখা গিয়েছিল এবং শাসনতন্ত্রে যে রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছে এসবের সামগ্রিক চিত্র কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সাথে বহুলাংশ মিলে যায়। একথাও অনেকটা সত্য যে, তুদেহ পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠী বিপ্লবের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এসব বাইরের আলামত ও প্রমাণাদি সত্বেও বলবো, ইরান বিপ্লব কমিউনিষ্ট নয়, ইসলামী বিপ্লব।

এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত কারণগুলো উপস্থাপন করা যায়।

১) এ বিপ্লবের পেছনে বিশ বছরের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে কুমের আলেম সমাজের সরবরাহ করা ইল্মী খাদ্য ও ইল্মী নেতৃত্ব, ডঃ আলী শরীয়তীর আন্দোলন মুখর চিন্তাধারা, শীয়া আকায়েদ অনুযায়ী ইমামত ও রাষ্ট্রের ধারণা, শাহাদত লাভের আকাংখা ও সর্বোপরি ইমাম খোমিনীর নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কমিউনিষ্ট চিন্তা ও কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব কখনো জনসমক্ষে ভেসে ওঠেনি। বরং এ সময়ে কমিউনিজম বিরোধী বহু রচনা ও বহু-পুস্তক বন্যা প্রবাহের মতো জনগণের মধ্যে ছড়িয়েছে।

২) এই বিপ্লবের সময় কমিউনিষ্টদের প্রিয় শ্লোগানগুলি, যার মধ্যে ভাত, কাপড় ও বাসস্থানের দাবী, কৃষক ও শ্রমিকদের ঐক্য, পুঁজিবাদ সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন শ্লোগান রয়েছে কোথাও শুনা যায়নি। এই বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল "আল্লাহু আকবর।" অত্যন্ত সচেতনভাবে এ শ্লোগানটি উচ্চারিত হয়েছে। কালেমা তাইয়্যেবার প্রথমাংশ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও সার্থকভাবে শ্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এ দুটি শ্লোগান দুনিয়ার সমস্ত পরাশক্তি ও সারা দুনিয়ার শক্তিকে ইরানীদের দৃষ্টিতে

www.nagorikpathagar.org

নগন্য ও তুচ্ছ করে দিয়েছে। তাদের মনের সমস্ত ভীতি-আশংকা কর্পূরের মতো উবে গেছে। লাভ-ক্ষতির হিসাব করার কোনো প্রয়োজনই তারা বোধ করেনা। হকের পথে শাহাদত লাভ করা তাদের জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ও সাফল্যের আলামতে পরিণত হয়েছে। জুলুম ও অন্যায়ের সাথে সমঝোতা করে জীবিত থাকাকে তারা মানব জীবনের অবমাননা মনে করে। এ বিপ্লবের সমস্ত বিষয়বস্তু তারা নিয়েছে কুরআন মজীদের আয়াত, তার পরিভাষা, নবীর হাদীস, ইমামদের বাণী ও ইমাম খোমিনীর বাণী থেকে। কমিউনিজমের সাথে এগুলির দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও নেই।

৩) আন্দোলন চলাকালে জনগণের কার্যকর প্রতিবাদ জ্ঞাপন, সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য যে দিনগুলো বাছাই করা হয় সবগুলিই ধর্মীয় দিক থেকে ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয় মহররমের ৯ ও ১০ তারিখে। এভাবে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনা থেকে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। মে দিবস বা অন্য কোনো দিন এ আন্দোলনের জন্য কোনো গুরুত্ব বহন করেনি।

৪) কৃষক ও শ্রমিকেরা কোনো "শ্রেণী চেতনার" মাধ্যমে নয় বরং নিজেদের মুসলমান হবার অনুভূতি ও ইসলামী চেতনার কারণে এ আন্দোলনে শরীক হয়। কেবল এ দুটি শ্রেণীই নয়, সমগ্র মিল্লাতই এতে অংশ গ্রহণ করে। উলামা, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সবাই একই ধরনের জোশ ও আবেগের সাথে এ আন্দোলনে যোগ দেয়। যাদের ভাত, কাপড়, গাড়ী-বাড়ীর কোনো অভাব ছিলনা তারাও এতে সমানভাবে অংশ নেয়। ইরানে আমেরিকার শেষ রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম সুলিভ্যান (Willium. H. Sullivan) তাঁর 'মিশন টু ইরান' (Mission to Iran) গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন : "এ বিপ্লবে তেহরান, ইস্পাহান, মাশহাদ, তাবরীয ও অন্যান্য শহরের ব্যবসায়ীরা অগ্রবর্তী হয়ে অংশ গ্রহণ করেছে। আমি আজো অবাক হয়ে ভাবি এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিপ্লবের জোশ কোথা থেকে এলো?" তিনি স্বীকার করেছেন : "মার্কিন দূতাবাস অতীতেও আমার নিজের সময়ও শ্রমিকদের যাবতীয় তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করেছে। আমি কিছুকাল পরে বাজারগুলির গুরুত্ব বুঝতে অনুভব করি। কিন্তু ব্যবসায়ী শ্রেণীর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগই ছিলনা। আমি বাজারগুলোয় যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সংরক্ষণ-মূলক ব্যবস্থাই এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিলো। আমি দূতাবাস কর্মচারী-দেরকে দোকানদারদের চিন্তা, প্রবণতা ও প্রপাগান্ডা সম্পর্কে আমাকে সবসময় অবহিত রাখার নির্দেশ দেই। কিন্তু এ কাজটিও কঠিন প্রমাণিত হলো। কারণ ব্যবসায়ীরা আমেরিকানদের মুখ দেখতে পারতোনা।" সুলীভ্যান

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন ঃ "ব্যবসায়ীরা কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে গেলো তা আমি আজো বুঝতে পারছিনা। ঐ ব্যবসায়ীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা বিপ্লবের জন্য সানন্দে নিজেদের টাকা-পয়সা বিলিয়ে দিতো, গাড়ী ও অন্যান্য সুবিধা দানের ব্যবস্থা করতো। কেউ আহত হলে রক্ত দেবার জন্য তারাও দলে দলে পৌঁছে যেতো।" এ সত্য সবাই স্বীকার করে, এ বিপ্লবের জন্য সকল শ্রেণীর জনগণ যে আবেগ, উদ্দীপনা ও ঐক্য সহকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই। এটি পুরোপুরি একটি শ্রেণীহীন ও জাতীয় বিপ্লব এবং ধর্ম এ বিপ্লবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

৫) মনসুর ফারাহিংগ তাঁর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আই উইটনেস রিপোর্ট—দি রিভলিউশান ইন ইরান" (ইরান বিপ্লবের চোখে দেখা বর্ণনা)-এ বিপ্লবের সমস্ত ক্রেডিট দিয়েছেন উলামায়ে কেরামকে। তিনি লিখেছেন ঃ

"সত্য বলতে ইরানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া আর কাউকে বিপ্লবের প্রাণ-শক্তি বলা যায় না। এদেশে দুই লাখ আলেম রয়েছেন। এরা হচ্ছেন বেসরকারী ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় গ্রুপ। জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এই আলেমগণই জনতার সাথে তাদের নৈতিক ভাষায় এবং তাদের চেতনা ও আবেগ অনুযায়ী কথা বলতে পারেন। একমাত্র আলেমগণই তাদের বঞ্চনা ও অস্থিরতাকে বিপ্লবী দাবী ও সংকল্পের রূপ দিতে সক্ষম।" এই বিপ্লবে অলিগলি থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র নেতৃত্ব ছিল উলামায়ে কেরামের হাতে। আর যেহেতু এ আলেমগণ সবাই কুমের একই জ্ঞান-কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত এবং একই আকীদা ও মযহাবের অনুসারী সবাই, তাই তাদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের একটা নজীরবিহীন সম্পর্ক কায়েম ছিল।

৬) এই বিপ্লবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এর নৈতিক প্রকৃতি ও ভূমিকা। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের হোতারা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকটা অবৈধ উপায়কে বৈধ মনে করে। তাদের ওখানে নৈতিকতার কোনো বাঁধন নেই। ইরান বিপ্লব নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের যে আদর্শ পেশ করেছে, তা তার ইসলামী হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কমিউনিষ্টরা সবচেয়ে কম প্রাণ দেবার ও সবচেয়ে বেশী প্রাণ নেবার দর্শনে বিশ্বাসী। আর এ বিপ্লবে ইসলামের পতাকাবাহীরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অন্যের প্রাণ নেয়া তো দূরের কথা তাদের গা স্পর্শও করেনি। তারা মোকাবিলা করেছে কেবল শাহের সশস্ত্র সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সাভাকের এজেন্টদের সাথে, সাধারণ মানুষের গায়ে তারা হাত লাগায়নি। ফরাসী, রুশও ও চীন বিপ্লবকে যদি ইরান বিপ্লবের সাথে এই দৃষ্টিতে তুলনা করা যায় যে, বিপ্লব চলাকালে সেখানে বিপ্লবী শক্তিগুলোর কতজন লোক মারাগিয়েছিল আর ঐ শক্তিগুলোর

www.nagorikpathagar.org

হাতে কতজন নিহত হয়েছিল, তাহলে উভয় ধরনের নিহত লোকদের হার হবে ইরানে সম্পূর্ণ উলটো। এখানে কাউকে হত্যা করার নয় বরং সত্যের পথে নিজের শাহাদত বরণ করার প্রেরণা সক্রিয় ছিল। এই প্রেরণার ফলেই ইরানে বিপ্লব সৃষ্টিকারীদের প্রতি সারা দুনিয়া নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা দান করেছে।

ইরান বিপ্লবের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা মানদণ্ড হচ্ছে মহিলারা। ইরান বিপ্লবে মুসলিম মহিলারা যে ভূমিকা পালন করেছেন দুনিয়ার কোনো বিপ্লবে মেয়েরা সে ভূমিকা পালন করেনি। পর্দার বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে লজ্জা-শরম ও চারিত্রিক পবিত্রতার যে দৃষ্টান্ত তারা কায়েম করেছে তা অন্য কোনো বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। পুরুষ ও মেয়েদের সম্মিলিত এত বড় সংখ্যাকেও ইতিপূর্বে কখনো রাজপথে দেখা যায়নি। এতদসত্বেও নৈতিকতা বিরোধী একটি ঘটনারও খবর কেউ শুনেনি। চরিত্র ও নৈতিকতার এ উন্নতমান একমাত্র ইসলামের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এটা কমিউনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্টদের চেহারা হতে পারেনা। এর দৃষ্টান্ত তো আমরা নিজেদের দেশে সকাল-সন্ধ্যায় হর-হামেশা দেখছি।

৭) বিপ্লব চলাকালে এবং তার পরে যুবকদের শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্য যে সমস্ত কাজ হয়েছে তা পুরোপুরি ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল। (এখানে শিয়া-সুন্নীর ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে ইরানীদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের আলোকে বিচার করুন।) দ্বীনী আহ্কাম ও আরবী ভাষা জানা এবং ইবাদতের ব্যাপারে ইরানী যুব সমাজ উন্নত দৃষ্টান্ত কায়েম করেছে। চারিত্রিক পবিত্রতা ও নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন করেছে। ধর্মের সাথে সম্পর্ক এত গভীর যে বর্তমানে শতকরা ৯০ জন যুবক দাড়ি রেখেছে এবং যুবতীরা পর্দার মধ্যে অবস্থান করছে। সমগ্র পরিবেশের ওপর ইসলামের গভীর প্রভাব এ বিপ্লবের পিছনে কমিউনিষ্টদের হাত আছে, একথা মিথ্যা প্রমাণ করে।

৮) ইরানে আজো 'লা শারকীয়া লা গারবীয়া আস সাওরীয়া ইসলামীয়া' —পূর্বের নয়, পশ্চিমের নয়, আমাদের বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব, এ শ্লোগান জোরে-শোরে উঠছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরান বিপ্লবের ইসলামী চরিত্রকে সামনে তুলে ধরা এবং মনের মধ্যে তাকে গেঁথে রাখা। প্রত্যেকটা অফিস, বিলডিং, গৃহ ও প্রত্যেকটা দেয়ালের গায়ে কুরআনের আয়াত সম্বলিত তখতি ঝুলছে। এভাবে একব্যক্তি তার চলাফেরা ও কাজ-কর্মের মাধ্যমে কুরআনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। বিপ্লবে যদি কমিউনিষ্টদের হাত থাকতো তাহলে ক্ষমতার হাত বদল হবার সাথে সাথে বিপ্লবীদের কেব্লাও বদলে যেতো। ধর্মকে যদি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হতো, তাহলে বিপ্লবের তিন বছর পরও তার এই চেহারা অপরিবর্তিত

www.nagorikpathagar.org

থাকতোনা। সমগ্র ইরানী জাতি আজো ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনা বুকে নিয়ে বেঁচে আছে এবং আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সব সংকটের মোকাবিলা করছে।

বিপ্লবী সরকারের বহু পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করা যেতে পারে, তার সমালোচনা করা যেতে পারে, একথাও বলা যেতে পারে যে, তার কোনো কোনো দিক ইসলামী নয় কিন্তু এটা ইসলামী বিপ্লব নয়, এ ফতোয়া দেয়া নিসন্দেহে বাড়াবাড়ি।

ইরান বিপ্লবের ভবিষ্যত

এ পর্যন্ত আমরা ইরান বিপ্লবের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। বিপ্লবের কার্যাবলী ও কৃতিত্বও পর্যালোচনা করেছি। এবার এর সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা যেসব বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেন সেগুলোর আলোচনা করবো।

আলোচনার প্রথম দিকে আমি বলেছি, ইরান থেকে এবার ফিরেছি আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে। আমি দোয়া করি এবং সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, এ বিপ্লব যেন আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুদের চক্রান্ত ও সব রকমের প্রতি বিপ্লব থেকে সংরক্ষিত থাকে। এ বিপ্লব যেন তার আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইসলামের ন্যায় ও সাম্য নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হতে এবং তার ভিত্তিতে ন্যায়, ইনসাফ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের এমন দৃষ্টান্ত কায়েম করতে সক্ষম হয় যা দেখে সারা দুনিয়া এ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে অনুভব করছি, বিপ্লবের যে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর রক্ষিত রাজসিংহাসন মহাশূন্যে নিক্ষেপ করেছিল, সে নিজের স্রোতের মুখে আজ নিজের শক্তিগুলোকে প্রবাহিত করে নিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লব এখনো আবেগের উচ্চতম শিখরে অবস্থান করছে। স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর শক্তি ও আবেগের প্রচন্ড চাপ রয়েছে। এ মনস্তাত্বিক অবস্থা বিশেষ মেয়াদ অতিক্রম করলে স্নায়ুগুলি ভাঙার মট্‌মট্‌ আওয়াজ শুনা যেতে থাকবে তারপর তার সমগ্র অস্তিত্ব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমার আশংকাগুলো হচ্ছে ঃ

১) ঘৃণা (HATRED) ও ভীতি (FEAR) দুটি এমন ধরণের অনুভূতি যা বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্র প্রস্তুতে ও তাদের সাফল্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবী নেতৃত্ব, যে ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে নির্মূল করতে চায় তার বিরুদ্ধে চরম ঘৃণার তুফান সৃষ্টি করে। তারপর সেই ব্যক্তি বা দল জনসমক্ষে এতই নিন্দনীয় ও ঘৃণার্হ হয়ে পড়ে যে, তার কোনো কথাই কেউ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়না।

www.nagorikpathagar.org

সে যা কিছু পেশ করে জনগণের অজস্র ঘৃণা ঝরে পড়ে তার ওপর। অবশেষে এ ঘৃণার পাহাড় শাসকদের ওপর পড়ে তাদেরকে নেস্তনাবুদ করে ফেলে। এই ঘৃণার পাশাপাশি চলে ভীতি। এ অনুভূতিটা তাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করে যে, তুমি যদি তোমার বিরোধী পক্ষের মাথা না ফাটাও তাহলে তারা তোমাকে জীবিত রাখবেনা। এ দুটো অনুভূতি আন্দোলনকে দান করে অপরাজের শক্তি। এ দুটো অনুভূতি সৃষ্টি করার ও তাদেরকে উত্তপ্ত করার জন্য বিকল্প নেতৃত্ব ও তার পেশকৃত ব্যবস্থার নজিরবিহীন হওয়ার ওপর দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য। এটিই নেতার ব্যক্তিত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে।

বিপ্লবের অধিনায়কের জীবনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সময় আসে তখন যখন তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে যান। বিজয় লাভ করার পর পরই ঘৃণা ও ভয়ের অনুভূতি বাষ্পের আকারে উড়ে চলে যায়। তখন অধিনায়কের কাছে আশা করা হয় তিনি তাঁর নতুন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবেন। এতদিন যে দৃষ্টি গুলো শত্রুর ওপর পড়ছিল এখন তা পড়তে শুরু করে অধিনায়কের ওপর এবং তারা আশা করতে থাকে তাঁর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আচরণের। এদিকে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও শত্রুর অবশিষ্ট শক্তিকে খতম করার জন্য অধিনায়কের প্রয়োজন হয় আরো কিছু সময়ের। এ সময়টা লাভ করার জন্য সে একটা শত্রুর হটে যাওয়ার পর আর একটা অপেক্ষাকৃত বড় শত্রুকে দাঁড় করিয়ে দেয় নিজের অনুসারীদের সামনে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনুসারীরা ঘৃণা ও ভীতির অনুভূতিকে নিজেদের মধ্যে জিইয়ে রাখবে এবং তিনি তাঁর কাজ করে যাবেন। বাইরের শত্রুর অস্তিত্ব একদিকে নতুন ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে বাঁধা সৃষ্টি করে, সমালোচনার পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতিকে তার উৎপাটনে লাগিয়ে রাখে। এ সিলসিলা দীর্ঘায়িত হলে শত্রুর বিরুদ্ধে চব্বিশ ঘন্টা বন্দুকের নিশানা তাক করে দাঁড়িয়ে থাকা জাতির হাতও এক সময় নিস্তেজ ও অসাড় হয়ে পড়ে। অনবরত নিশানাবাজীর কারণে তার মাথা ঘুরতে থাকে এবং সে পড়ে যায়।

আমার মতে, ইমাম খোমিনী শাহের পতনের পর জনগণের ঘৃণা ও ভীতির অনুভূতিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আগের পর্যায়ে অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি আবেগ ও জোশ কমাবার অনুমতি দেননি। বরং তাকে অপরিবর্তিত রাখার নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজছেন। এ দৃষ্টিভংগী সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ভীতির হাতে এখন ইমাম খোমিনী নিজেই বন্দী হয়ে পড়েছেন। যে নেতা গতকাল পর্যন্ত কোনো প্রকার রক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই ২০ লাখ জনতার মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতেন তিনি আজ নিজের বিজিত রাষ্ট্রে ৫ হাজার সশস্ত্র পাসদারান রক্ষী বাহিনীর দেহ-

www.nagorikpathagar.org

রক্ষা ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় বাস করছেন। তাঁর দেহরক্ষীর সংখ্যা শাহের দেহরক্ষীদের দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তিনি যেখানে বাস করেন তার আশে-পাশে দুই ফার্লং পর্যন্ত এলাকার শত শত বাড়ী জনশূন্য। তাঁর কাছে পেঁছবার জন্য কয়েকবার দেহ তাল্লাশীর পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এখন তিনি ময়দানে আযাদীতে, যেখানে এখনো তাঁর পক্ষে লাখো কণ্ঠে আবেগময় শ্লোগান উচ্চারিত হয়, নিজে স্বশরীরে আসতে পারেন না। তাঁর জন্য উৎসর্গীত লাখো জনতার জন্য জাতীয় উৎসব দিবসে পয়গাম পাঠিয়ে দেন নিজের পুত্রের হাতে। কিন্তু পুত্র পাঠিত রুহুল্লাহর পয়গাম জনতার রুহকে উত্তপ্ত করতে পারে না। সত্য বলতে কি সিংহকে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ দেখে আমার বুকে বিষম বাজলো। বরং তার ওপর করুণা হতে লাগলো। বলা যেতে পারে এবং একথা বলাও হয়েছে, দুশমনের এজেন্টরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইরাকের সাথে যুদ্ধ চলছে, মুজাহিদীনে খাল্‌ক দেশের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এ রক্ষা-ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ যুক্তি কিছুটা শক্তি-শালী হতেও পারে। কিন্তু চিন্তার বিষয়, যে দেশে সবচাইতে জনপ্রিয় নেতার প্রাণ সব সময় বিপদের মুখে থাকার অনুভূতি এত বেশী প্রবল ও সাধারণ পর্যায়ে বিস্তৃত সে দেশে একজন সাধারণ মানুষ কেমন করে তার প্রাণের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে? যেখানে একটা পাতা পড়লে গুলী চলার সম্ভাবনায় ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবনের কতটুকু চিহ্ন ও সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে? সমাজে পারস্পরিক আস্থা সেখানে কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে?

শাহের ব্যাপারটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা নিঃসন্দেহে একটি বিপ্লব বিরোধী দৃষ্টিভংগী। কিন্তু 'ক্ষমা' গুণটিকে একেবারে ঘরের তাকে উঠিয়ে রাখাও তো ভালো নয়। ইমাম খোমিনীর মেজাজ সম্পর্কে নওবারী সাহেব বড় চমৎকার মন্তব্য করেছেন "To destroy, you need dynamite, to construct, you need other things"—ধ্বংস করার আর উড়িয়ে দেবার জন্য বারুদের প্রয়োজন কিন্তু গড়ার জন্য অন্য কিছুর দরকার।

ইমাম খোমিনী বারুদের রূপ নিয়ে শত্রুর একটা দুর্গ ধ্বংস করেন, তারপর আর একটা দুর্গ খোঁজেন। তাঁর অনুসারীদের জন্য তিনি জিহাদের ময়দান এত বিস্তৃত করে দিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করতে থাকলেও তাদের বিজয়ের সিলসিলা খতম হবেনা। রাজভবন দখল করার পর তারা মার্কিন দূতাবাস দখল করাকে নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করলো। দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত সমগ্র জাতি এই ময়দানে জিহাদে লিপ্ত রইলো। ইরাক এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করলো। সে ইরানের সীমান্তে ঢুকে পড়লো। ইমাম খোমিনী এবার তৃতীয় টার্গেট পেয়ে গেলেন। এখন তিনি এ টার্গেট লাভে

www.nagorikpathagar.org

ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য যথার্থ এবং আমরাও তা সমর্থন করি। অর্থাৎ আক্রমণকারী তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার পরই যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। কিন্তু এটা কেবল সঠিক ও বৌঠিক দৃষ্টিভংগির ব্যাপার নয় বরং ইমাম খোমিনী এ যুদ্ধ থেকে তিনটি স্বার্থ হাসিল করতে চান।

১) ইরানী সেনাদলের সীমান্তে যুদ্ধরত থাকা।

২) এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের সরকারের পতন ঘটানো এবং শাহকে বিতাড়িত করার পর আর একটা বিজয় লাভ করা।

৩) বিপ্লবের জোশ ও উদ্দীপনা অপরিবর্তিত রাখার জন্য ইরানী জাতির সামনে একটি বিদেশী শত্রু দাঁড় করিয়ে রাখা।

উম্মাহ কমিটির সাম্প্রতিক ইরান সফরের পূর্বে আমি বলেছিলাম খোমিনী সমঝোতার কোনো ফরমুলা গ্রহণ করবেননা। কারণ, প্রথমত, এটা প্রকৃতি বিরোধী। দ্বিতীয়ত, ইরাকের সাথে যুদ্ধ তাঁর নিজের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রটি বন্ধ হয়ে গেলে তাঁকে এখনই আর একটি নতুন ক্ষেত্র বের করতে হবে। একপক্ষ নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে এ যুদ্ধকে কাদেসিয়ার যুদ্ধ গণ্য করেছে। আর অন্য পক্ষ ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টির জন্য একে কারবালার যুদ্ধে পরিণত করেছে। এখন কারবালাওয়ালাদের বক্তব্য হচ্ছে, সবাই শহীদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবেনা।

খোমিনী ইরাক ছাড়াও মিসর, সউদী আরব, জর্দান এবং অন্যান্য বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিপ্লব করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন, সারা দুনিয়া 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর পতাকাতলে না আসা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতে থাকবে। আমরা দুটি পরাশক্তিকে পরাজিত করবো। আমরা বিপ্লব এক্সপোর্ট করবো। তিনি ইরানী খেলোয়াড়দেরকেও বলেছেন, তারা যে দেশে যাবে বিপ্লবের বাণী বহন করে নিয়ে যাবে।

দেশ জয় ও দেশ শাসনের এ সংকল্প ইরানী জাতিকে কি কখনো স্থির হয়ে বসার সুযোগ দেবে? ইমাম খোমিনীর নিজের জীবন তো এই বিশ্ব মিশনটি বাস্তবায়ণের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রামেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর যা কিছু হবে তা জানে পরবর্তীরা।

ইমাম খোমিনী কাবাঘর ও মসজিদে নববীকেও 'আযাদ' করার সংকল্প রাখেন। এ সম্পর্কিত তাঁর একটি বাণী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকীতে হোটেল ইসতিকলালের লাউঞ্জে ব্যানারের আকারে টাঙানো হয়েছিল। তিনি বায়তুল মাকদাসকে ইহুদীদের হাত থেকে মুক্ত করার ও ইসরাইলকে ধ্বংস করার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত মজলুম ও নিগৃহীত লোকেরাও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর মতে এভাবে দুনিয়ার সমস্ত

www.nagorikpathagar.org

কাজ একমাত্র ইরানী যুবকরাই করতে পারবে। আর যুবকরাও মনে করে খোমিনীর নেতৃত্বে তারা এসব কিছু করতে পারবে। এ কারণেই তারা অনবরত এ শ্লোগান দিয়ে চলছে ঃ খোদা ইয়া! খোদা ইয়া! তা ইনকিলাবে মেহ্দী খোমিনী রা নিগাহদার—হে খোদা! হে খোদা! ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব পর্যন্ত খোমিনীর হেফাজত করো।

এ শ্লোগানটিকে একটি দোয়া ও আকাংখা হিসেবে ধরলে এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনা। কিন্তু একথা সবাই জানে, সাধারণ লোকের মতো ইমাম খোমিনীকেও দুনিয়ার জীবন শেষ করে চলে যেতে হবে। বর্তমানে তিনি বাইরে নজর দেবার চাইতে যদি ভেতরে নজর দিতেন তাহলে হয়তো তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন তাকে বেশী শক্তিশালী ও সুফলদায়ক করতে পারতেন। ইরান নিজের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে সক্ষম হতো। যুদ্ধ, অনবরত যুদ্ধের ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে তা ভবিষ্যতে কমিউনিষ্টদেরকে নিজেদের খেলা খেলবার সুযোগ করে দেবে। ইসলামী বিপ্লবের এই মৌলিক বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। অন্যথায় তা কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পথে পাড়ি জমাবে। বনিসদর ও নওবারী সাহেবান একবার ইমাম খোমিনীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'ইসলামী বিপ্লব মানুষের ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান করতে আসেনি। নিছক ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করা ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য নয়।' একদিক দিয়ে বিচার করলে এ কথাটা ঠিক। কিন্তু এমন পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দেওয়া যেখানে ভাত-কাপড় সংগ্রহ করাটাই একটা সমস্যায় পরিণত হয়, সেখানে তা ইসলামী বিপ্লবের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। শত্রুতো অর্থনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক অভিযান পরিচালানার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। .....অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদ এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুভব করেন যে, বিপ্লবের অধিনায়ক একে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ইসলামী বিপ্লব এমন একটি দেশ পেয়েছিল যেখানে ছিল সম্পদের প্রাচুর্য, যে দেশটি ছিল উন্নত ও স্বনির্ভর। নতুন সমাজ গঠন ও অনুন্নত লোকদের জীবনধারা উন্নত করার জন্য যেসব উপায়-উপকরণ, সম্পদের প্রয়োজন ছিল তা দেশের মধ্যেই মওজুদ ছিল। কারোর কাছে হাত পাতার প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু আবেগের অগ্নিকুন্ড ঘরের সবকিছুই আজ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। ইমাম খোমিনী বিপ্লবের তুফান মেলের এক্সলিটার থেকে নিজের পা সরাননি, অনবরত তা পা দিয়ে দাবিয়ে চলেছেন। এই একরোখা নীতি শাহের কর্তৃত্ব খতম করতে সক্ষম হয়েছে সত্য, কিন্তু এই সংগে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও ধ্বংস করে দিয়েছে। এর নবজীবন লাভ করার ও

www.nagorikpathagar.org

শক্তিশালী হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। দেশের গত তিন বছরের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করে আমি অনুভব করেছি, দেশের মূল্যবান অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভবপর ছিল। বিপ্লব সফল করার জন্য সেগুলো ধ্বংস করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা।

এহেন ব্যক্তি পূজা ইসলামের প্রকৃতি বিরোধী

২) ইমাম খোমিনীর ইরান বিপ্লবের আরেকটি বিষয় আমাদের মনকে ভীষণভাবে সংশয়িত করে। সেটি হচ্ছে, মারাত্মক ধরনের ব্যক্তি পূজা। শিয়া আকীদায় ইমামের মর্যাদা নিঃসন্দেহে অতি উচ্চ। ইমাম খোমিনী যে বিরাট কার্যসম্পাদন করেছেন তাও নজিরবিহীন এতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু আমরাই বা কেন, সারা দুনিয়া ইমাম খোমিনীর রাজনৈতিক দূরদর্শীতা, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বিস্ময়কর কার্যাবলীর স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এসব সত্বেও মুসলিম সমাজে এই ভয়ংকর ব্যক্তিপূজা ইসলামের প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে মোটেই খাপ খায়না। ইরানে বর্তমানে ইমাম খোমিনীর ছবি হিন্দুদের ঠাকুর-দেবতার মূর্তির পর্যায়ে পেঁাছে গেছে। কোনো বিলডিং, তার ভেতরের কোনো অংশ, গৃহ, দোকান, মাদ্রাসা. এমনকি মসজিদের বারান্দা, মেহরাব, লাইটপোষ্ট, গাছের গুঁড়ি, বাস, ট্রাক তথা এমন কোনো সচল ও অচল বস্তু নেই যার গায়ে ইমাম খোমিনীর ছবি টাঙানো বা সাঁটানো নেই। দেশে এমন কোনো বই, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী নেই, যা ইমাম খোমিনীর চিত্রে সজ্জিত নয়। এ ব্যাপারে আমি তেহরানেই একটা মজার মন্তব্য শুনেছি। একব্যক্তি বলেনঃ "আমি দাবী করে বলছি, আপনি আমার দাবীর সত্যতা যাচাই করে নিন, যখন থেকে ক্যামেরা আবিষ্কার হয়েছে, তখন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সে কোনো এক ব্যক্তির এ পরিমাণ ছবি উঠায়নি যেমন উঠিয়েছে ইমাম খোমিনীর।" আমি ৭০ কোটি চীনাদের দেশে মাও-সে-তুং এর ছবির কথা বললাম। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জোর দিয়ে বললেনঃ মাও-এর ছবি খোমিনীর ছবির অর্ধেকও হবে না।

ধর্মীয় মহলও এ চিত্র-প্রচারণাকে অপছন্দ করেছেন। জনৈক ফকীহর একটি বাক্য আমাদের কাছে পেঁাছেছে। তিনি বলেছেনঃ "ইমাম খোমিনী ইমাম মেহদীর মর্যাদা লাভ করেছেন।"

চিত্র অভিযানের সাথে সাথে আর একটি জিনিশও আমদের চোখে ঠেকেছে। বাণী সাজাবার ব্যাপারে যে ধারা রাখা হয়েছে তা হচ্ছেঃ প্রথমে কুরআনের, তারপর খোমিনীর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহ ওয়াজহাহু, অন্যান্য ইমামগণ ও ইমাম খোমিনীর সমসাময়িক সমস্ত আলেম ও নেতাদের বাণীকে পর্দান্তরালে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র সফরকালে আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু কোথাও রসূলের একটি হাদীস দেখিনি। হযরত আলীর (রাঃ) একটি বাণী দেখেছি মাত্র এক জায়গায়—কুমে পাসদারানের হেড কোয়ার্টারের ক্যান্টিনে। দেয়ালের গায়ে বাণীটি লেখা ছিল। বাণীটি ছিল পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত। এ ছাড়া সব জায়গায় কেবল ইমাম খোমিনীর বাণী এবং তাঁর ছবি। আর কালেমা তাইয়েবার অবস্থা হচ্ছে, তার প্রথমাংশ শ্লোগান ও তখতির ওপর লেখার মাধ্যমে সর্বত্র ছেয়ে রয়েছে মনে হলো। এই সংগে "নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবর" ধ্বনিটি নিম্নোক্ত বর্ধিত অংশটি সহ সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে ঃ

'আল্লাহু আকবার—খোমিনী রাহবার ! খোমিনী রাহবার !'

অর্থাৎ শ্লোগান, দেয়াল-লিখন, বাণী ও ছবির মাধ্যমে মানুষের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি যতদূর গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে তার সাহায্যে সমগ্র জাতির মনকে এক ব্যক্তির সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশনের যতগুলো প্রোগ্রাম আমার দেখার ও শুনার সুযোগ হয়েছে তার সবগুলোই ইমাম খোমিনীর কোনো ছবি, বাণী, বক্তৃতা বা তাঁর সাথে কোনো সাক্ষাতকারের খবর দিয়েই শুরু হতে দেখেছি।

এই একব্যক্তিকেন্দ্রীকতা যদি জনগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ফলশ্রুতি হতো তাহলে বলার কিছু থাকতোনা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ কাজটির দায়িত্ব নিয়েছে সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় প্রচারণা বিভাগ। কাজেই এ কাজটি ইমাম খোমিনীর নিজের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারেই সম্পাদিত হচ্ছে। হতে পারে এতে ব্যক্তির অহংবোধের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থকে তিনি সামনে রেখেছেন। কিন্তু একথা সত্য, তিনি নিজের ছাড়া আর কারোর অবদান, কৃতিত্ব ও নেতৃত্ব সুলভ যোগ্যতার কথা শুনা পছন্দ করেননা। ডঃ মুসাদ্দেকের স্মরণে অনুষ্ঠিত শোকসভার কথা আগেই বলেছি। এ সভায় বক্তৃতা করার জন্য বনীসদর উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু খোমিনীর নির্দেশে হিজবুল্লাহ সংগঠন উপস্থিত জনতার উপর আক্রমণ চালিয়ে সভা তছনছ করে দেয়। এবার আরেকটা ঘটনার কথা শুনুন। এ ঘটনাটি তাঁর মনের গতির সঠিক দিক নির্দেশ করবে।

ইরান বিপ্লবকে চিন্তার খোরাক যোগাবার ব্যাপারে ডঃ আলী শরীয়তীর স্থান অনেক উঁচুতে। আর সত্য বলতে কি, পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নরত ইরানী ছাত্রদেরকে এই আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করার দায়িত্ব তিনিই সম্পাদন করেছেন। শাহের আমলে তিনি কারাভোগ করেন এবং এই পথেই জীবন দান করেন। পাশ্চাত্যকে সম্বোধন, তার চিন্তা ও মতবাদকে বাতিল প্রমাণ করা এবং পাশ্চাত্য পরিবেশে লালিত যুবকদের নিকট থেকে ইসলামী সভ্যতার স্বীকৃতি আদায় করার ব্যাপারে তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী বিরাট কার্য সম্পাদন করেছে। তিনি ইরানের যুব সমাজ ও উচ্চ

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে হিরোর মর্যাদা লাভ করেছেন। কুমের উলামায়ে কেরামও তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একটি মাত্র অভাব ছিল। তিনি ফকীহ ছিলেন না। দ্বীনি মাদ্রাসার সনদ তিনি লাভ করেননি। জুব্বা ও পাগড়ী তিনি পরিধান করতেন না। কিন্তু ইরান বিপ্লবে তাঁর স্থান নির্ধারণ করতে চাইলে তাঁকে প্রথম সারির বিশিষ্টদের মধ্যে দেখা যাবে। শাহাদতের ক্ষেত্রেও তিনি প্রথমদের অন্তর্ভুক্ত।

গত বছর জুনে তাঁর স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি হয় তেহরানের যে মহল্লায় তিনি থাকতেন সেই মহল্লায়। বর্তমানে তাঁর পিতা সেখানে অবস্থান করছেন। তাঁর পিতাও একজন অত্যন্ত দ্বীনদার, সাহসী ও সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে মহল্লাবাসীদেরকে এ ধরনের অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু শরীয়তীর ভক্ত ও অনুরক্ত মহল্লাবাসীরা একথা মানতে প্রস্তুত হয়নি। অনুষ্ঠান শুরু হবার পর ডঃ শরীয়তীর পিতা তাঁর বক্তৃতায় জুলুম নির্যাতনের কঠোর নিন্দা করে বলেন ঃ 'এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই তো আমার ছেলে প্রাণ দিয়েছে।' তাঁর মুখ থেকে একথা বের হবার সাথে সাথেই ডাইনে বাঁয়ে মহল্লার অলি গলি থেকে পাসদারান ও হিজবুল্লার সশস্ত্র বাহিনী সভার ওপর আক্রমণ চালায়। সভা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ডঃ শরীয়তীর পিতাকে অপমান করা হয়। সভামণ্ডপে ডঃ শরীয়তীর যে বইগুলো রাখা ছিল তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। জনৈকা প্রতিবাদকারী মহিলার পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়া হয়। এভাবে ডঃ শরীয়তীর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। তাঁর প্রতি জাতির শ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিন টেলিভিশন প্রায় অনিচ্ছা সহকারে কয়েক মিনিটের একটা প্রোগ্রাম পেশ করে নিজের দায়িত্ব শেষ করে।

ইমাম খোমিনীর বিদেশে অবস্থানকালে আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারী আন্দোলনের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৬৩ সালে যখন শাহ খোমিনীকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন তখন তিনিই কুমের আলেমগণের পক্ষ থেকে এ ফতোয়া জারী করলেন যে, ইমাম খোমিনী হচ্ছেন জাতির 'মারজা' (সমগ্র জাতি যাদের ওপর আস্থা রাখে এবং জাতীয় ও দ্বীনি ব্যাপারে যাদের ফতোয়া মেনে চলে।) আর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো মারজাকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা যেতে পারেনা। এতে শাহ অসহায় হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে তিনি খোমিনীকে দেশান্তর করেন।

বিপ্লবের পর কোনো কোনো পলিসির ব্যাপারে খোমিনী ও মাদারীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এগুলো সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। শরীয়ত মাদারীকে দমন করার জন্য ইমাম খোমিনী নিজেই পাসদারানের জংগী দলের নেতৃত্ব দেন। শরীয়ত মাদারী ব্যক্তিগতভাবে কোনো সংঘর্ষ চাননি। তাঁর

www.nagorikpathagar.org

ভক্তবৃন্দ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। তাদেরকে হাতের মুঠোয় আনার পর ইমাম খোমিনী নিজেই শরীয়ত মাদারীর সাথে দেখা করেন। ব্যাপারটি চুকেবুকে যায়। কিন্তু শরীয়ত মাদারীকে যবনিকার অন্তরালে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে খবরের কাগজ এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের কোথাও মাদারীর নাম দেখা যায় না। তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া বড়ই কঠিন। তাঁর তৎপরতাও এখন নিজের ঘর ও মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর চলাফেরা ও তৎপরতার ওপর কড়া নজর রাখা হয়। সম্প্রতি পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলো খবর দিয়েছিল তিনি নজরবন্দী আছেন। সরকারী পর্যায়ে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়নি তবে নজরে রাখা হয়েছে।

ডঃ মুসাদ্দেক, ডঃ আলী শরীয়তী ও আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারীর সাথে এহেন ব্যবহার, মতবিরোধ পোষণকারী অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তিকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, তাদের দেশ থেকে পলায়ন প্রভৃতির বিবরণী এবং পাবলিসিটি অভিযানকে কেবলমাত্র এক ব্যক্তির ইমেজ সৃষ্টি ও তাকে খুব বেশী উঁচু করা এবং এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া থেকে ইমাম খোমিনীর নিজের মানসিক প্রবণতা আন্দাজ করা যেতে পারে।

অবশ্য সমগ্র জাতির দৃষ্টি ভঙ্গী একব্যক্তির প্রতি কেন্দ্রীভূত করার কিছুটা ভালো দিকও আছে। এর ফলে একক নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। শ্রবণ ও আনুগত্য ব্যবস্থার প্রচলন হয়। নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়। জাতির মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীতে ঐক্য আসে। কিন্তু এসব ভালো ও কল্যাণকর দিকের তুলনায় এর ক্ষতিকর দিকগুলোর সংখ্যা অনেক বেশী। এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ও তার ওপর নির্ভরশীল ব্যবস্থা থেকে ঐ ব্যক্তি সরে যাবার সাথে সাথেই তার মধ্যে মারাত্মক কম্পন শুরু হয়ে যায়। এ কম্পনে সমাজ-ব্যবস্থার ভিত নড়ে ওঠে। তার সাথে সংযুক্ত আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, ভক্তি ও প্রেমের সমগ্র বেতার ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এধরনের বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্যস্থান পূরণ করা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি এ শূন্যস্থান পূরণ করতে আসেন আসল অধিনায়কের তুলনায় তাকে অনেক হালকা মনে হতে থাকে এবং সমাজের বিক্ষিপ্ত আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা তাকে কেন্দ্র করে সুসংগঠিত হতে পারেনা।

একটি জাতির সমগ্র জীবনকে কোনো এক মরণশীল ব্যক্তির সাথে এভাবে সংযুক্ত করে দেবার ফলে যে ক্ষতি হয় তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবী নিজের অনুসারীদের মনে একথা বসিয়ে দেনঃ 'আমরা হচ্ছি মরণশীল মানুষ। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের আসল রবের

www.nagorikpathagar.org

সাথে তোমাদের বন্দেগীর সম্পর্ক স্থাপন করাবার জন্য। তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করো। তাঁর দিকে দেখো। যা কিছু চাইবার তাঁর কাছে চাও।'

এ ব্যাপারে ইসলাম কোন্ ধরনের প্রকৃতি ও মেজাজের অধিকারী? এর সবচাইতে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত উমর (রাঃ)-র অবস্থা দেখে বুঝা যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্কের আতিশয্য এপর্যায়ে মনও মস্তিষ্কের ওপর কী মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ইন্তিকালের খবর শুনতেই হযরত উমর (রাঃ) তলোয়ার হাতে নিয়ে চীৎকার করে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! যারা বলবে, রসূলুল্লা (সঃ) ইন্তিকাল করেছেন— আমি তাদের হাত-পা কেটে নেবো।"

খবর পেয়েই হযরত আবুবকর (রাঃ) মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহর (সঃ) হুজরায় পৌঁছে গেলেন। চেহারা মোবারক থেকে চাদর সরিয়ে ঝুঁকে পড়লেন এবং চুম্বন করে বললেন ঃ

"আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গীত, আল্লাহ আপনার ভাগ্যে যে মৃত্যু লিখে দিয়েছিলেন আপনি তার স্বাদ লাভ করেছেন। এরপর আপনার আর কোনো মৃত্যু হবেনা।"

তারপর বাইরে এসে হযরত উমর (রাঃ) কে থেমে যাবার ও চুপ করে থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"হে লোকেরা, জেনে রাখো! যে ব্যক্তি মুহাম্মদের (সঃ) ইবাদত করতো তার জেনে রাখা উচিত তিনি মারা গেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করে তার জেনে রাখা উচিত তিনি জীবিত আছেন এবং তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না।

এরপর সূরা আল-ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতটি পড়ে শুনালেন। আয়াতটির অনুবাদ হচ্ছে ঃ

"মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রসূল চলে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পিছনের দিকে ফিরে আসবে? মনে রেখো, যে পেছনের দিকে ফিরে আসবে সে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান দেবেন।"

এ আয়াত শুনার সাথে সাথেই হযরত উমর (রাঃ) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, এ সময় তাঁর মনে হয়েছিল যেন

www.nagorikpathagar.org

তাঁর পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সঃ)ইবাদত করতেন না। তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন। ভীষণভাবে ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসার আতিশয্য তাঁর এ দশা করেছিল। এখন ইমাম খোমিনী যদি তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসাকে ইবাদত ও পূজা করার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর জাতির কি দশা হবে ?

আল্লাহ তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করুন। তিনি যখন জাতির মধ্যে থাকবেন না তখন মারাত্মক আঘাত ও অসহনীয় শোকে জাতীয় চেতনায় যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে তা থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য এখন থেকেই যেন তিনি সমগ্র জাতীয় চেতনা ও মানসকে ভারসাম্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেন।

নব্য ও প্রাচীনের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে

৩) আমার মতে আশংকার আর একটা দিক হচ্ছে নব্য ও প্রাচীনদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ব্যবধান। ইতিপূর্বে ইরান বিপ্লবের বড় বড় সাফল্যগুলো বর্ণনা প্রসংগে আমি বলেছিলাম ঃ এ বিপ্লবটি প্রথমবার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ও দ্বীনী মাদ্রাসার উলামাদেরকে এক লাইনে দাঁড় করিয়েছে এবং একটি লক্ষ্য অর্জনে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাদের মধ্যে কেবল ঐক্য ও আস্থার সম্পর্কই কায়েম হয়নি বরং সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই সংগ্রামে আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা বিশেষ করে যুব-ছাত্র সমাজ উলামাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে. তাদের একটি ইংগিতে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং সব রকম কষ্ট সহ্য করেছে। শাহবিরোধী আন্দোলনে দ্বীনী মাদ্রাসার তালেবে এলেমদের তুলনায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী সংখ্যায় শাহাদত বরণ করেছে। দেশের বাইরেও পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অধ্যয়নরত ছাত্ররাই সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনটা পরিচালনা করেছে।

ইসলামী বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসনের পর বিদেশী প্রভুদের শিক্ষানীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয় অভিযানের আওতাধীনে আধুনিক শিক্ষিত ও প্রাচীন শিক্ষিতের মধ্যে এক মহা বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। এ বিরোধ প্রত্যেক দেশে মুসলমানদেরকে দুভাগে বিভক্ত করে তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিয়েছিল। তারা একে অন্যের প্রাণের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। মৌলবী কোনো মিষ্টারের মুখ দেখাই পছন্দ করতোনা। আর মিষ্টার মৌলবীর অস্তিত্ব টের পেলেই নাক সিটকাতো। এ দু'দলের

www.nagorikpathagar.org

কোন্দলের মধ্যে জাতি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ইরান ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত থাকলেও বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজয় এ দেশটিতেও তার ধ্বংসকর অভিযান চালিয়েছিল এবং এখানেও দুটো পরস্পর বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করেছিল। ইসলামী আন্দোলন এ দুটি ভিন্নমুখী প্রতিষ্ঠানকে ভেঙেচুরে সমগ্র জাতিকে একটিমাত্র বিন্দুতে—তওহীদের কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত করেছে। আর শত বছরের দূরত্ব মাত্র কয়েক দন্ডের মধ্যে অতিক্রম করেছে। পূর্বে যে ছিল প্রতিযোগী সে এখন সহযোগী। ইরানে

وا عتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

(অর্থাৎ আল্লাহর রশিকে সবাই মিলে একসাথে মজবুত করে ধরো আর তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না) আয়াতটি বাস্তব চিত্রের রূপ নিয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের কিছুদিন পর এ দূরত্ব আবার বাড়তে শুরু হয়েছে। বাজারগান, ইবরাহীম ইয়াযদী, কুতুবজাদাহ, বনীসদর, নওবারী এবং তাদের মতো আরো অসংখ্য লোক ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়েছে। মাদ্রাসার উলামাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যেতে থেকেছে। মার্কিন জিম্মীদেরকে আটক রাখা কালে এ দূরত্ব অতি দ্রুত বেড়ে গেছে। ইমাম খোমিনী নিজে যেহেতু উলামা-গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত, তাই তিনি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি দূরত্ব কমাবার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং অন্য দলটি তাঁর কাছে অভিযোগ করতে করতে ধীরে ধীরে দূরে চলে গেছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের আস্থা ও সহযোগিতা, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কুরবানী এবং আলেম সমাজের নেতৃত্বে কাজ করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ইরান বিপ্লবের একটি চমকপ্রদ ফলশ্রুতি ছিল। এ সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যুবকদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তাদের উন্নততর যোগ্যতা ছিল জাতির মহা-মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্পর্শকাতরতা, আত্মম্ভিরতা ও সংকীর্ণমনতা তাদেরকে পেছনে হটিয়ে দিতে শুরু করেছে। আমি প্রথমবার ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে অর্থাৎ বিপ্লবের দশমাস পরে মার্কিন জিম্মীদের আটক রাখার সময় এবং তারপর ১৯৮১ সালের মার্চে আমেরিকা, বৃটেন ও কানাডায় ইরানী যুবক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, হোটেল মালিক ও সাধারণ দোকানদারদের জোশ ও উদ্দীপনা দেখেছি। কিন্তু এখন তাদের সেই মুড বদলে যাচ্ছে। তাদের চেহারায় চিন্তা ও আশংকার ছাপ সহজেই পরিলক্ষিত হয়। তাদের আবেগে আর তেমন উত্তাপ দেখা যায়না।

আধুনিক ও পুরাতনের মধ্যে পরস্পরকে গ্রহণ করার ও মেনে নেবার প্রবণতার যখন তুলনা করি তখন আমি অনুভব করি, এ ব্যাপারে আধুনিকরা

www.nagorikpathagar.org

অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে গেছে এবং পুরাতনরা তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে। অথচ পুরাতনকে তার সাফল্যের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে নতুন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক ও পুরাতনকে একই রঙে রঙীন করে না দেয়া পর্যন্ত আধুনিকের নৈকট্য, সংসর্গ ও সহযোগিতার খুব বেশী প্রয়োজন রয়েছে।

আমার মতে আধুনিক ও পুরাতনের মধ্যে এই দূরত্ব বাড়াবার ব্যাপারে দেশের বাইরে পাশ্চাত্য প্রেস এবং দেশের ভেতরে সোভিয়েটলবিও নিজেদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আর উলামাগণ নিছক নিজেদের জিদ, শ্রেষ্ঠত্ব বোধ (**Superiorety complex**),প্রাধান্য বিস্তারের আকাংখা, বেলায়েতে ফকীহর নেশা ও পশ্চিমের প্রতি নিজেদের ঐতিহ্যিক ঘৃণার বশবর্তী হয়ে বড়ই সরলপ্রাণে এ ব্যাপারটিকে দীর্ঘায়িত করে চলছেন। তারা অবচেতনভাবে বিপ্লবের শত্রুদের সচেতন প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দান করে যাচ্ছেন।

পাশ্চাত্য চাচ্ছে ওলামাদের থেকে নিজের পরাজয়ের বদলা নিতে। তাদের প্রচারযন্ত্রগুলো মামুলি মতবিরোধকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে পেশ করছে। আলেমদেরকে বিদ্রূপ করা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সমর্থন করাই তাদের লক্ষ্য। তাদের এই সমর্থন আসলে ওলামা ও আধুনিক শিক্ষিতদের ঐক্যে ফাটল ধরাবার একটা অস্ত্র। বনীসদর সম্পর্কে আমেরিকার সি, আই, এ, নিজেই এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, খোমিনীর বিরুদ্ধে সামরিক উত্থান করার জন্য তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। এর মূল্যও পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ঘৃণা ভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং খোমিনীর প্রতি তাঁর আস্থাকে বিক্রি করতে রাজি হননি। কিন্তু বনীসদরের এই আস্থা ও বিশ্বস্ততাকে সংশয়ের চোখে দেখার পথ তৈরী করলো কে ? তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকার এজেন্ট হবার অভিযোগ আনার জন্য দায়ী কে ? এটা একমাত্র পাশ্চাত্যের প্রচারণা কৌশল। তারা বনীসদরের পক্ষে অস্বাভাবিক প্রপাগান্ডা চালিয়ে তার পতনের ব্যবস্থা করেছে। আমেরিকা এদলটিকে উলামাদের থেকে কেটে নিয়ে তাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকারীতার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনার যোগ্যতা থেকে ইসলামী বিপ্লবকে বঞ্চিত করতে চায়। বাজারগানের মতো প্রধানমন্ত্রী, ইয়াযদী ও কুতুবজাদার মতো পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বনীসদরের মতো প্রেসিডেন্ট আমেরিকা ও ইউরোপের জন্য অধিক মাথা ব্যাথার কারণ হতো। কারণ, এরা তাদের ঘরের খবর জানে, তাদের সব রহস্য এদের নখদর্পনে এবং তাদেরই তাত্ত্বিক হাতিয়ারে এরা সজ্জিত। আলেম সমাজ তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখলে, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করলে,

www.nagorikpathagar.org

তাদের জায়গায় নিজেরাই দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলে এবং নিজেদের অনভিজ্ঞতার ফল হাতে হাতে লাভ করলে আমেরিকার স্বার্থ উদ্ধার হয়। এ উদ্দেশ্যে আমেরিকার প্রপাগাণ্ডামিশনরী আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মর্যাদা যতদূর সম্ভব খারাপ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং আলেম সমাজকে তাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

এদিকে তুদেহ (মার্কসবাদী) পার্টি ও তার সহযোগী অন্যান্য গ্রুপও আধুনিক শিক্ষিত সমাজের তাত্বিক শিল্পগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা থেকে নতুন সরকারকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা আলেমদের দ্বীনি জোশও জযবাকে খুব বেশী উত্তেজিত করছিল। কিন্তু উন্নয়ন ও পুনর্গঠন বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য যে ধরনের সতর্কতা, সচেতনতা ও ভারসাম্যের প্রয়োজন তা যেন কোথাও কদম জমাতে না পারে এজন্য তারা সাবধানী পদক্ষেপ নিয়েছিল। রেশনিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের হাতে থাকলে এক্ষেত্রে তাদের অনভিজ্ঞতা থেকে এই বামপন্থী গোষ্ঠি তিনটি ফায়দা হাসিল করতে পারে।

(ক) মাদ্রাসার এই আলেমগণ তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, মানতেক, ইতিহাস, সীরাত, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান রাখেন কিন্তু তারা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তার সাথে জড়িত বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জটিল কর্মপ্রণালী এবং শিল্প ও কারিগরী বিষয়াবলী সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখেন না। কাজেই এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তারা খুব বেশী আগ্রহী হবেন না এবং এগুলোকে গুরুত্বও দেবেন না। তাদের এ অজ্ঞতা ও অনাগ্রহ দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম দেবে। এ সমস্যাগুলো বামপন্থী সংগঠন গুলোকে যেসব শ্লোগান সরবরাহ করবে তা তাদের পরবর্তী অভিযানের জন্য শক্তিশালী অস্ত্রের কাজ করবে।

(খ) ভবিষ্যতে যেসব সংকট দেখা দেবে এবং সেগুলোর বুক থেকে যেসব ঘৃণার উন্মেষ ঘটবে তার সবগুলোর মূল লক্ষ্য হবে উলামায়ে কেরাম। আর যেহেতু তারাই সব কিছুর জন্য দায়ী তাই তাদেরকে শিকার করা হবে অত্যন্ত সহজ। তাদের ওপর থেকে জনগণের ভক্তি উঠে যাবে। এভাবে এই অপরাজেয় শক্তিটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, যারা এদেশে ইসলাম ছাড়া আর কাউকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি।

(গ) উলামাগণ আমেরিকা, সমগ্র ইউরোপ ও আরব জগতের সাথে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করে ইরানকে একাকী ও একঘরে করে দিয়েছে। তার এ অবস্থা প্রতিবেশী রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূল। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ও

www.nagorikpathagar.org

ইসলামপন্থী দলের অধিকাংশই রাশিয়ার ঘোর বিরোধী। আলেমরাও রাশিয়ার কট্টর বিরোধী। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী রাশিয়ার মোকাবিলা করার পথ তৈরী করতে পারবে। সম্ভবত তারা পাশ্চাত্যের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ ও সহনীয় সম্পর্ক কায়েমের পথ নির্মান করতে পারবে। কিন্তু উলামাগণ নারাজ হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মনের ঝাল ঝেড়ে দেবেন। তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেবেন। তার সাথে বিবাদ করার পথ তৈরী করবেন। তুদেহ পার্টির লোকেরা এ বিবাদকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর এভাবে রাশিয়ার জবাবী পদক্ষেপ গ্রহণের পথ খোলাসা হবে।

ইমাম খোমিনী ও তাঁর সহযোগী আলেমগণ এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে যদি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের পশ্চাদাপসরণ রোধ করতে পারেন এবং তাদের আস্থাও সহযোগিতা বহাল করার জন্য নিজের ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর দৃষ্টিভংগীকে সামান্য উদার করতে পারেন তাহলে তা হবে বিপ্লবের পথে একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ।

৪) আমার আশংকার আরেকটি বিষয় হলো ইরানের শিক্ষাগত ভবিষ্যত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গত আড়াই বছর থেকে বন্ধ রয়েছে। বিপ্লবে ব্যারোমিটারের পারদের স্তর সবসময় উঁচুতে রাখার জন্য ছাত্রদের ঘাড়ে তার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ভেতর-বাইরের দুশমনদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার, নতুন প্রশাসনিক ও পরিচালনা কাঠামোর বোঝা উঠাবার এবং "জিহাদী জীবনের" নির্মাণমূলক কার্যক্রম তৎপরতা জারী রাখার দায়িত্বও তাদের ওপর চাপিয়া দেয়া হয়েছে। এরা সবাই প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত, সশস্ত্র ও বেতনভূক। এরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্বাদ পেয়েছে। বিপ্লবী সরকারের পরিকল্পনাগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করাও এদের শক্তির ওপর নির্ভর-করে। এদেরকে কেমন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফেরত পাঠানো যাবে? আমার মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার সময়টি হবে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পরীক্ষার সব চাইতে কঠিন সময়। যখনই দুধ ও পানি আলাদা হয়ে যাবে—তখনই চেনা যাবে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে বিপ্লবীদের দলে ভিড়ে যারা কাজ করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ক'জন তুদেহ পার্টির ও অন্যান্য দুশমন দলগুলোর কর্মী। কারা অস্ত্র রেখে দিয়ে বইপত্র হাতে তুলে নিয়েছে আর কারা বন্দুকের নল তাক করে আছে। তেহরানে সেই কঠিন সময়টির অনুভূতি সর্বত্র বিরাজমান। এখন ইমাম খোমিনী নিজের প্রয়োজনের খাতিরে সেই সময়টিকে পিছিয়ে দিতে চাইবেন যতদূর সম্ভব। কমপক্ষে নিজের জীবনে তিনি এ সময়টিকে আসতে দিতে চাইবেন না। এদিকে এ সময়টির পিছিয়ে যাওয়া বিপ্লবের শত্রুদেরও স্বার্থের অনুকূল বরং তাদের প্রয়োজনও।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য তারা নিজেদের প্রয়োজন মতো বেশী সময় পাবে। ইমাম খোমিনীর দু'চোখের পাতা এক হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি তাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না হয় তাহলে সেটিই হবে তাদের জন্য ভালো। এভাবে পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার মোকাবিলা করা তাদের জন্য সহজ হবে।

ইমাম খোমিনীর জীবদ্দশায় এ পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়ার মধ্যেই ইরানের স্বার্থ নিহিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলা উচিত। এখনই সশস্ত্র যুব ছাত্রদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত। কোনো গোল-যোগ দেখা দিলে ইমাম খোমিনী নিজের নেতৃসুলভ যোগ্যতা খাটিয়ে তা ঠিক করে নেবেন। পরবর্তীকালে অন্য কোনো নেতার পক্ষে এ পরিস্থিতির সহজ মোকাবিলা সম্ভব নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত খোলার কোনো আলামত আমি দেখতে পাচ্ছিনা। কিন্তু আমি দোয়া করি এবং আমার আন্তরিক কামনা এগুলো অনতিবিলম্বে খুলে যাক। এ কাজটি হয়ে গেলে ইরান তার একটা আভ্যন্তরীণ সংকট কেটে উঠবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চাইলে আবার কিছুদিন পরে বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে কিন্তু এখন একবার সেগুলো খোলা উচিত। এভাবে বন্ধু ও শত্রু চেনা যাবে এবং দেশ সংকট মুক্ত হবে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব তওহীদের শ্লোগানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক আকীদা থেকে এ বিপ্লব শক্তি অর্জন করেছে এবং শিয়া-সুন্নী বিরোধকে কোথাও মাথা তুলতে দেয়নি, এটা হচ্ছে এ বিপ্লবের একটি অতিউজ্জল ও প্রশংসনীয় দিক। সমগ্র ইসলামী দুনিয়া বিপ্লবের এ দিকটিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। ইরানী ভাইদের সাথে ঐক্য ও একাত্মতার জযবা ও অনুভূতি জাগে মুসলমানদের সমস্ত দল ও উপদলের মধ্যে। বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর এ জযবা ও অনুভূতির অনুকূল পরিবেশকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোনো কোনো সরকারী নীতি ও পদক্ষেপ একে আহত করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। কিন্তু কুর্দিস্তান ও ইরানী বেলুচীস্তানের সুন্নী প্রধান এলাকাকে এর মধ্যে শামিল করা হলোনা। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান গুলোয় এ এলাকাসমূহ তাদের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো। মুসলিম দেশগুলোর বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রদূতাবাস ও বিদেশাগত মুসলমান মেহমানদের জন্য যদি তেহরানে কমপক্ষে সুন্নীদের একটি মসজিদ কায়েম করার অনুমতি দেয়া হতো তাহলে এতে শিয়া-সুন্নী ঐক্য মজবুত করার ব্যাপারে অনেক বেশী সাহায্য পাওয়া যেতো। কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। পিকিং ও মস্কোয় সুন্নীদের মসজিদ আছে কিন্তু তেহরানে নেই, একথাটা যেন কেমন বেমানান ঠেকে।

www.nagorikpathagar.org

শাসনতন্ত্রে শিয়া ইস্না আশারীয়া আকীদা মোতাবিক ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম গণ্য করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে দেশের নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য বড় বড় পদে নিযুক্তির জন্য বেলায়াতে ফকীহর দর্শন অনুযায়ী শিয়া হওয়া অপরিহার্য। জাফরী ফিকাহ দেশের পাবলিক ল' অর্থাৎ সর্ব সাধারণ আইন। পারসনাল ল' এর ক্ষেত্র পর্যন্ত সুন্নী আকীদাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সংখ্যা গরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী আমরা এ মতাদর্শকে সঠিক বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাদের বলতে হচ্ছে, অন্যান্য মুসলিম দেশের বেলায় ইরান তার এ নীতি মেনে চলছেনা। যেমন ধরুন পাকিস্তানের ব্যাপারে তারা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উলটো পথ ধরেছে। নিজেদের দেশে তারা একটি পাবলিক ল' এর স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু পাকিস্তানে যারা দুটি পাবলিকল'—এর দাবী উঠিয়েছে ইরান তাদের সমর্থন করছে এবং উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। ইরান নিজের প্রণীত নীতির প্রতি সমর্থন জানালে তাকে ন্যায়নিষ্ঠতা ও ইনসাফপ্রিয়তা বলা যেতো এবং সারা দুনিয়ার জন্য তা আদর্শ হতো। ইরানী শাসনতন্ত্র সুন্নীদেরকে বাস্তবে একটি ফেরকা বানিয়ে দিয়েছে। অথচ কোনো সুন্নী প্রধান মুসলিম দেশে শিয়াদেরকে এভাবে ফেরকা বানিয়ে দেয়া হয়নি। ইরানে কোনো সুন্নী দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক (নীতি নির্ধারক) পদ লাভ করতে পারেনা। অথচ বিভিন্ন সুন্নী প্রধান মুসলিম দেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং দেশের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ (নীতি নির্ধারক) পদের জন্য কেবলমাত্র মুসলমান হবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ফলে,শিয়াদের সেখানে দেশের প্রশাসনের বড় বড় পদে এমন কি রাষ্ট্র প্রধানের পদে অধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। বিপ্লব যেখানে শিয়া সুন্নীর পার্থক্য মিটিয়ে দিয়েছিল সেখানে শাসনতন্ত্র ইরানকে একটা কট্টর শিয়া ষ্টেটে পরিণত করে শিয়া সুন্নীর পার্থক্যকে আইনগত রূপ দিয়েছে।

ইরাকের হামলার পরপরই সর্বশক্তিতে নিজের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই ছিল শিয়া-সুন্নী ঐক্যের দাবী। সাদ্দাম হোসেনকে প্রাণ খুলে গালি দিন কিন্তু তাকে 'কাফের' ও 'মুশরিক' আখ্যা দান করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু এধরনের কোনো সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। নিজের বিপ্লব মিসর, সউদী আরব, জর্দান ও অন্যান্য দূরের ও কাছের মুসলিম দেশগুলোয় এক্সপোর্ট করার কথা বলার ফলে অযথা এসব দেশের ধর্মীয় মহলে শিয়াসুন্নী ধরনের চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে এবং সরকারগুলোর প্রকৃতি ও ভূমিকার কথা বাদ দিলেও জনগণের পর্যায়ে এর প্রতিক্রিয়া মন্দই হয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে এই জনগণ সাধারণ ভাবে ইরান বিপ্লবের সমর্থক ছিল। আমার মতে বিপ্লব রপ্তানী করার ঘোষণায় ইরানের কোনো লাভ হয়নি। বরং এই জোশ ও জযবার বশবর্তী

www.nagorikpathagar.org

হয়ে সে নিজের ক্ষতি করে বসেছে এবং অনর্থক নিজেকে শিয়া-সুন্নী ঝগড়ার মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য দেশে বিপ্লবের ব্যাপারটা সে সেখানকার জনগণের ওপর ছেড়ে দিতো। সেখানকার বিপ্লবী শক্তিগুলো তার কাছে সাহায্য ও পথ নির্দেশ চাইতো। তাহলে নিজের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে সহজেই অন্য দেশে সাপ্লাই দিতে পারতো।

ইরানের একথাও অনুভব করা উচিত, প্রত্যেকটি দেশে চোখ বন্ধ করে তার বিপ্লব নকল করা সম্ভব নয়। সেখানে 'কুম' কোথায় থেকে আসবে ? 'বেলায়েতে ফকীহ' কে সরবরাহ করবে ? একই চিন্তাধারার বরং একই শিক্ষায়তনের ২ লাখ উলামা কোথায় পাওয়া যাবে ? যুগের ইমামের আকীদাও নায়েবে ইমামের চিন্তা মাথার মধ্যে কিভাবে ঢোকানো যাবে ? শাহ ও তার সাভাক কোথায় থেকে আসবে ? আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই খোমেনী কে সাপ্লাই দেবে ?

বিপ্লবের পরিসর অন্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিবর্তে ইমাম খোমিনীর এখন নিজের দেশেই তাকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এটিই ইসলামী দুনিয়ার ঐক্য ও সংহতি এবং শিয়া-সুন্নী ঝগড়া থেকে দূরে থাকার দাবী। মুসলিম বিশ্ব আগে থেকেই বিভিন্ন কারণে বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এর মধ্যে আবার বিরোধের কোনো নতুন ফাকড়া ঢুকে গেলে তাতে ইরানের কোনো ফায়দা হবেনা, সামগ্রীকভাবে মুসলিম উম্মাহ ও এতে লাভবান হবেনা বরং এর সবটুকু ফায়দা লুটে নেবে ইসলামের শত্রুরা।

এগুলো ছিল আমার আশংকা। ইরান বিপ্লব সম্পর্কে এ আশংকাগুলো ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি অনেক বার চিন্তা করেছি। হৃদয়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করেছি। তবুও অনেক কষ্টে কেবলমাত্র সত্যকে প্রকাশ করার অনুভূতি নিয়ে আমি এ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি জানি, আমার এ আলোচনার পর ইরান বিপ্লবের ভবিষ্যত সম্পর্কে পাঠকদের মনে হয়তো একটা নৈরাশ্যের ভাব জেগে উঠবে। কিন্তু আমি এতটুকু বলতে পারি, শেষের দিকে যে কথাগুলো আমি বলেছি সেগুলির উদ্দেশ্য অযথা হতাশা ছড়ানো নয়। বরং চিত্রের সব দিক সামনে আনাই উদ্দেশ্য। বিষয়টির কোনো দিক যাতে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থাকে সে চেষ্টাই আমি করেছি। অবস্থার উজ্জ্বল দিকগুলো যদি সব সময় সামনে থাকে এবং তার অন্ধকার দিকগুলো খুঁজে বের করার অনুভূতিই যদি খতম হয়ে যায় তাহলে এতে সবসময় ক্ষতিই হয়ে থাকে। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ের আনন্দে মত্ত হয়ে মালে গণীমাত সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের ডাইনে বাঁয়ে ওৎ পেতে থাকা ও ঘোরাও করা শত্রুদের কথা ভুলে গিয়েছিল, ফলে, বিজয় পরাজয়ের রূপ নিতে বেশী সময় লাগেনি।

www.nagorikpathagar.org

ইরান বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপ্লব। এ বিপ্লব কেবল ইরানীদের নয়, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ও মজলুম মানুষদের মনে বিজয়ের অনুভূতি জাগিয়েছে। তাদের মনে সৃষ্টি করেছে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা। তাদের শিরায় উপশিরায় এনেছে জীবনের নতুন উত্তাপ। তাদের স্নায়ুতন্ত্রী থেকে ভীতি ও অসহায়তার অনুভূতি নির্মূল করে দিয়েছে। এ বিপ্লবকে যারা ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের একান্ত কামনা, এ বিপ্লব যা কিছু অর্জন করেছে তা যেন টিকে থাকে। এ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, চিরস্থায়ী হোক, এবং দুশমনদের প্রত্যেকটা আঘাত তার লৌহ প্রাচীরের গায়ে লেগে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাক, এ হচ্ছে এ বিপ্লবের প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ীর মনের বাসনা। এহেন আকাংখা ও বাসনা যারা পোষণ করে তাদের আন্তরিকতা, ঈমান ও ইরানের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অনুভূতির দাবীই হচ্ছে, এ বিপ্লবের পথে তারা যেখানেই কোনো কাঁটা দেখবে সংগে সংগেই তা চিহ্নিত করবে। যেখানেই তার মজবুত প্রতিরক্ষা প্রাচীরগাত্রে কোনো খুঁত, কোনো ফাটল দেখবে সংগে সংগেই তা জানিয়ে দেবে এবং এই সংগে এর মেরামতের কোনো ব্যবস্থামূলক প্রস্তাব থাকলে তা-ও পেশ করবে। এভাবে দুশমনের ক্ষতি করার পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হবে।

খয়ের খাঁ ও ভাঁড়ের দলের প্রশংসার সাগরে ডুবে আমরা ইতিহাসে বহু মহান ব্যক্তিত্বকে এবং আমাদের দেশে ও আমাদের চোখের সামনে বহু লোককে ধ্বংস হতে দেখেছি। প্রশংসা থাকতে হবে বৈধ সীমার মধ্যে, তা যেন চাটুকারিতা ও ভাঁড়ামিতে পরিণত না হয়। এটা তো শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব স্বীকারের একটা ভদ্রতাপূর্ণ পদ্ধতি। কোনো স্বার্থ, প্রয়োজন বা দুর্বলতার কারণে বিপদ আশংকা গুলো দেখার ও জানার পরও তা চিহ্নিত না করা ও নীরব হয়ে থাকা বন্ধুত্ব নয়, আসলে শত্রুতা। হতে পারে আমরা যাকে বিপদ মনে করছি সেটা আসলে বিপদ নয়, আমাদের দৃষ্টিভ্রম মাত্র। কিন্তু বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব ও শুভাকাংখার তাগিদে সেটা অবশ্য চিহ্নিত করতে হবে। অনুসন্ধানের পর সেটা ভীতিহীন প্রমাণিত হলে চিহ্নিত কারীর চাইতে বেশী খুশী আর কে হবে?

ইরান বিপ্লবের যে সব দিকের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তা আমার বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধ ও শুভাকাংখার অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত।। এর ফলে ইরান বিপ্লবের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং তার বিস্ময়কর কার্যাবলীর গুরুত্ব কোনো অংশে কমেনি। আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি। দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে সব রকমের বিপদ ও ষড়যন্ত্র থেকে সংরক্ষিত রাখেন। কারণ, তার নিরাপত্তার মধ্যে আমাদেরও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের, বিশেষ করে ইসলামী বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে কর্মরত সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত তার ওপর

www.nagorikpathagar.org

নির্ভর করছে। আল্লাহ এ বিপ্লবের হেফাজত করুন। আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও মহায়তায় এর বিরুদ্ধে দুশমনদের প্রত্যেকটা ষড়যন্ত্র নস্যাত হয়ে যাক। এ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহর নামে। তাই তাঁর কাছেই আমরা আবেদন জানাচ্ছি তাঁরই নামে শাহাদত বরণ কারী হাজারো শহীদের রক্তের মর্যাদা রক্ষার।

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com